কোরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য

খোশরোজ কিতাব মহল

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কোরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য

মূল ঃ

হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদ

আবুল বাশার

খোশরোজ কিতাব মহল

১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১৭৭১০, ৭১১৭০৮৪

প্রকাশক
মহীউদ্দীন আহমদ
খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুমোদনক্রমে প্রথম বাংলা সংস্করণ
আগস্ট, ২০০৩

মূল্য : ৮০.০০ টাকা
US $ 1.00

কম্পোজ ও মুদ্রণ
পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
ঢাকা—বাংলাদেশ

Bengali Translation of **"Some Secrets of the Qur'an"** By Harun Yahya. Copyright Harun Yahya. Bengali Edition Published by Mohiuddin Ahmad of **Khoshroz Kitab Mahal,** 15 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone : 7117084, 7117710.

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ মানবজাতির কল্যাণে, মানবজাতির কাছে বহু গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন। যারা এসব রহস্য অনুধাবনে অক্ষম তাদের সারাটা জীবনই কাটে বিপদে ও সঙ্কটে। পক্ষান্তরে যারা এগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন তাঁরা স্বচ্ছন্দ, রোমাঞ্চপূর্ণ ও আনন্দমুখর জীবনযাপন করেন। মানুষের জন্য আল্লাহর উন্মোচিত কতিপয় গোপন রহস্যই হচ্ছে এই বইয়ের বিষয়বস্তু।

— প্রকাশক

সূচি

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

জীবাশ্মের ইতিহাস

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত উপদেশ বাণী
সেই লোকদের জন্য যাঁরা আমার ইবাদত করে।

—সূরা আম্বিয়া ঃ আয়াত ১০৬

আলোর দিশারী

কোরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য

অবতরণিকা

আমাদের চেনা-জানা মানুষের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা প্রকৃত ঈমানদার দাবি করলেও কুরআনে তাঁদের বিশ্বাস নেই। কুরআনকে জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাঁরা চরম বিভ্রান্তি, মোহ আর হতাশার মধ্যে কালাতিপাত করছেন। কিন্তু কুরআনই হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের জীবনব্যাপী সত্যজ্ঞানের আকর এবং শুদ্ধতম ও পবিত্রতমরূপে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির রহস্যপুঞ্জের আধার। কুরআনে যার ভিত্তি নেই এমন সকল তথ্যই অসঙ্গত, অলীক ও অগ্রহণযোগ্য। যারা কুরআনের অনুসারী নয় তারা মোহাচ্ছন্ন। পরকালে তারা ক্ষতির সম্মুখীন ও দুর্ভোগে নিপতিত হবে।

কুরআনে সালাত, আদেশ, নিষেধ ও উচ্চ নৈতিক আদর্শাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ্ অনেক গোপন রহস্য মানুষের গোচরীভূত করেন। এগুলো হচ্ছে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ রহস্যাবলী। মনোযোগী দৃষ্টিভঙ্গি সারাজীবনই এগুলোকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। কুরআন ছাড়া আর কোন সূত্রেই এসব রহস্যের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। কুরআনই হচ্ছে সেসব গোপন রহস্যের অনন্য সূত্র যা কোন ব্যক্তি যত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্নই হোন না কেন —অন্য কোন সূত্র থেকে লাভের আশা করতে পারবেন না।

কুরআনের কিছু প্রচ্ছন্ন বাণী রয়েছে যা কিছু লোক খুঁজে পায় না অথচ অন্য কিছু লোকের কাছে তা পরিষ্কারভাবে পরিদৃষ্ট হয় এটাও আল্লাহর সৃষ্ট আরেকটি রহস্য। যারা পবিত্র কুরআনে ব্যুৎপত্তি লাভ করেও এসব রহস্যের সন্ধান করে না তারা বিপদে ও সংকটে আছে, থাকবে। ভাগ্যের পরিহাসে তারা জানে না তাদের বিপদের কারণ কি। পক্ষান্তরে, যারা কুরআনের এসব রহস্য সম্পর্কে অবহিত তারা সহজ আনন্দময় জীবনযাপন করে থাকে।

কুরআন যেকোন ব্যক্তির বোধগম্য হবার জন্যে যথেষ্ট স্বচ্ছ, সহজ ও অকপট। কুরআনে আল্লাহর বাণী ঃ

> হে মানবজাতি! তোমাদের কাছে একটি স্পষ্ট দলিল অবতীর্ণ হয়েছে। তোমাদের রব তোমাদের সন্নিধানে একটি স্বচ্ছ জ্যোতিঃ

> প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সেই বিশ্বাস শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে তারা তাঁর করুণা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে এবং আল্লাহ্ তাঁদেরকে তাঁর অভিমুখী সরল পথে পরিচালিত করবেন।
>
> — সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৪-১৭৫

কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ অতি জটিল সমস্যাবলী সমাধানে এবং ঘোরতর দুর্জ্ঞেয় দর্শনতত্ত্ব বোধনে ও বাস্তবায়নে সক্ষম হলেও কুরআনের স্বচ্ছতা ও সারল্য অনুধাবনে অক্ষম। এটিও একটি বড় রহস্য। এই ঐহিক জগতের নশ্বর জীবনের প্রকৃতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে প্রতিদিন তারা অবধারিত মৃত্যুর কাছাকাছি হয়। কুরআনের গোপন রহস্যাবলী বিশ্বাসীদের জন্যে পরম শান্তি ও অবিশ্বাসীদের জন্যে চরম যাতনা বয়ে আনে— ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই। একটি আয়াতে আল্লাহ্ কথাটি বলেছেন এভাবে ঃ

> আমরা কুরআনে যা নাজিল করেছি তা বিশ্বাসীদের জন্যে আরোগ্য ও করুণারূপে কাজ করে, কিন্তু অন্যায়কারীদের কেবল ক্ষতির বোঝাই বাড়িয়ে তোলে।
>
> — সূরা আল-ইসরা ঃ ৮২

আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষের কাছে গোপন রহস্যরূপে নাজিলকৃত কয়েকটি আয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়েই এই পুস্তকে আলোচনা করা হবে। যখন কোন ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পড়ে এবং আয়াতে অন্তর্নিহিত রহস্যের প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় তখন তার অবশ্যকরণীয় হচ্ছে, ঘটনাপুঞ্জে নিহিত ঐশী উদ্দেশ্য সন্ধান করা এবং কুরআনের আলোকে সব কিছুর মূল্যায়ন করা। তাহলেই মানুষ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করতে পারবে যে কুরআনের গোপন রহস্যগুলোই যেমন তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি অন্যদের জীবনও।

সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর চোখ মেলে তাকালেই আল্লাহর সৃষ্ট রহস্যসমূহের অভিপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সেই দেখার চোখ পাবার জন্যে শুধু মনোযোগী হতে হবে, ঐশী ভাবনায় বিভোর হতে হবে। তখন সে বুঝতে পারবে বহু লোক ক্ষতিকরভাবে যেসব আইন প্রতিষ্ঠা করে তার জীবন

কোনক্রমেই সেসব আইনের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র আইনই হচ্ছে বৈধ আইন, বৈধ কর্তৃত্ব। একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ রহস্য এটি। বহু শতাব্দী ধরে বহু সংখ্যক মানুষ যেসব বিধি ও জীবন চর্যা পরমার্থ বলে গ্রহণ করেছে আসলে সেগুলোতে কোন মঙ্গল নেই। বস্তুত এ সব মানুষ মোহগ্রস্ত। সত্য তা-ই যা কুরআনে নাজিল হয়েছে। যে কেউ আন্তরিকতার সাথে কুরআন পাঠ করবে, কুরআন ও বিশ্বাসের আলোকে ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করবে এবং আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে জীবনযাপন করবে, সে-ই পরিষ্কারভাবে এসব রহস্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং আরও ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে একমাত্র আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রতিটি সত্তার ওপর, প্রতিটি হৃদয়ের ওপর, প্রতিটি চিন্তার ওপর। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ

আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাব দিগন্তে এবং তাদের অন্তঃকরণে, যে পর্যন্ত তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে এটাই সত্য। তোমাদের আল্লাহর জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে তিনি সর্বদর্শী ? কী! তারা কি তাদের আল্লাহর মুখোমুখী হবার বিষয়ে সন্দিহান ? কী! তিনি কি সবকিছু পরিবেষ্টনকারী নন ?

—সূরা ফুসিলাত ঃ ৫৩-৫৪

আল্লাহ্ সবার প্রার্থনায়ই সাড়া দেন

সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে তিনি মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং মানুষ তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি তাতে সাড়া দেন।

প্রাসঙ্গিক একটি আয়াতের বয়ান নিম্নরূপ ঃ

> আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে আপনাকে প্রশ্ন করে, আমি কাছেই আছি। যদি কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তাদের উচিত আমার প্রতি সাড়া দেয়া এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাহলে তারা ঠিক পথে পরিচালিত হবে।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৬

উপরের আয়াতের বয়ান অনুসারে আল্লাহ সকলেরই সন্নিকটে বিরাজমান। তাঁর গোচরেই আছে প্রত্যেকের ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা, উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ, অর্ধোচ্চারিত প্রতিটি শব্দ এবং এমনকি মনের গহীনে লুক্কায়িত ভাবনা। ফলত যে কেউ তাঁর দিকে ফিরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি তা শ্রবণ ও অবধান করেন। এটাই হচ্ছে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রহমত এবং তাঁর করুণা, বরকত আর তাঁর অসীম শক্তির প্রকাশ।

আল্লাহর আছে অফুরান শক্তি ও অশেষ জ্ঞান। সমগ্র বিশ্বজগতের সবকিছুরই মালিক তিনি। মহাশক্তিধর মানুষ থেকে বিশালতম ধনভাণ্ডার পর্যন্ত, বেহেশতের মহত্তম সত্তাসমূহ থেকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জীব পর্যন্ত জগতের সবকিছুই তাঁর এবং তাঁরই ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের অধীন।

এ সত্যে যাঁর অটল বিশ্বাস তিনি আল্লাহর কাছে যেকোন বস্তু প্রার্থনা করতে এবং সে প্রার্থনা মঞ্জুর হবার আশা করতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি অবশ্যই সব ধরনের চিকিৎসার শরণ নেবেন। তবুও, যেহেতু তিনি জানেন কেবল আল্লাহ্ই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে দিতে পারেন তাঁর কাছেই আরোগ্যের জন্যে প্রার্থনা করবেন তিনি। অনুরূপভাবে, কোন প্রকার ভীতি ও শঙ্কায় আর্ত ব্যক্তি সব রকম ভীতি-শঙ্কা

থেকে মুক্তি ও স্বস্তি লাভের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। কোন কার্য সম্পাদনে সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর কৃপা ভিক্ষা করতে পারেন। সত্যের পথে পরিচালনা, অন্য সকল ঈমানদারদের সঙ্গে বেহেশত নসীব করা, স্বর্গ-নরক-ঐশী শক্তি সম্পর্কে পূর্ণতর জ্ঞান লাভ করা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া— এ রকম অসংখ্য বরকত লাভের জন্য আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করা যায়। নবী করীম (সঃ) এই বিষয়ের ওপর জোর দিতে গিয়েই বলেছেন ঃ

> আমি কি এমন একটি অস্ত্র তোমাদের গোচরে আনব যা একাধারে তোমাদেরকে শত্রুর অপকার থেকে রক্ষা করবে এবং তোমাদের স্ব অবস্থানে টিকে থাকার শক্তি বৃদ্ধি করবে? তারা বলল ঃ হাঁ, রাসূলুল্লাহ (সঃ)। তিনি বললেন ঃ দিন-রজনী আল্লাহকে ডাকো, 'প্রার্থনা'-ই হচ্ছে বিশ্বাসীর অস্ত্র।[১]

কুরআনে বর্ণিত আরেকটি রহস্য সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ "'মানুষ ভাল'র জন্য যেমন প্রার্থনা করে তেমনি মন্দ'র জন্যও করে। আবেগতাড়িত হওয়াই মানুষের প্রবণতা।" — সূরা আল-ইসরা ঃ ১১। মানুষের সকল প্রার্থনাই মঙ্গলকর হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে সম্পদের প্রার্থনা করা হল আল্লাহ্‌র কাছে। কিন্তু আল্লাহ্ হয়তো এই প্রার্থনায় কল্যাণকর কিছুই দেখতে পাবেন না কেননা সম্পদ-সমৃদ্ধি ওই সন্তানকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নিতে পারে। এই অর্থে আল্লাহ প্রার্থনাটি শোনেন এবং সর্বোত্তম পন্থায় সাড়া দেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত নিন ঃ নির্ধারিত সময়ে কারও সঙ্গে সাক্ষাতের কর্মসূচি যেন বিনষ্ট না হয় সে জন্যে প্রার্থনা করা হল। কিন্তু এমন হতে পারে যে সাক্ষাতের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে নির্ধারিত সময়ে না গিয়ে পরে, অর্থাৎ বিলম্বে যাওয়াই প্রার্থনাকারীর জন্যে কল্যাণকর হবে, কেননা নির্ধারিত সময়টিতে অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তার জাগতিক জীবনের কল্যাণ হবে। আল্লাহ সেটা জানেন এবং তিনি সাড়া দেন প্রার্থনাটি যে- আকারে উত্থাপিত হয়েছে সে আকারে নয় বরং বিকল্প সর্বোত্তম পন্থায় ; অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রার্থনাকারীকে শোনেন কিন্তু প্রার্থনায় তার জন্যে হিতকর কিছু দেখতে না পেলে, তার জন্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট তা' তিনি সৃষ্টি করেন। এটি স্বতঃই একটি বড় রহস্য।

কোন প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে এই রহস্যটি সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারা ভাবে আল্লাহ্ বুঝি প্রার্থনাটি শুনতে পাননি। এটা অজ্ঞতা ও একটি বিকৃত বিশ্বাস। কেননা "আল্লাহ্ মানুষের সঙ্গে তার কণ্ঠনালীর চাইতেও ঘনিষ্ঠতরভাবে সংলগ্ন।"

—সূরা কাফ ঃ ১৬

তিনি মানুষের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ, অনুচ্চারিত প্রতিটি চিন্তা তথা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে অবহিত। এমনকি নিদ্রামগ্ন অবস্থায় সে যে স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নে যা দেখে সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ অবহিত। আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা। তাই প্রতিবার প্রার্থনার সময় এ কথাটি অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে আল্লাহ তার প্রার্থনাটি উপাসনারূপেই গ্রহণ করবেন এবং সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়ে তা মঞ্জুর করবেন ও তার জন্যে যা সর্বোত্তম তা-ই সৃষ্টি করবেন।

প্রার্থনা শুধু যে এবাদতেরই একটি রূপ তা নয়, এটি মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্র একটি মূল্যবান উপহার। তার কারণ আল্লাহ্ মানুষকে প্রার্থনার মাধ্যমে যে কোন বস্তু লাভে সক্ষম করেছেন ; অবশ্য তার জন্যে যা শুভ ও কল্যাণকর বলে আল্লাহ্ মনে করেন। প্রার্থনার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ "বলুন ঃ তুমি যদি আল্লাহ্কে না ডাকো তাহলে আল্লাহ কি করবেন ? কিন্তু তুমি সত্যকে অস্বীকার করেছো, সুতরাং শাস্তি তোমার অবধারিত।"

—সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭৭

বিপন্ন ও অভাবগ্রস্তদের প্রার্থনা আল্লাহ মঞ্জুর করেন

প্রার্থনাকালেই আল্লাহর সঙ্গে বান্দার নৈকট্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ্র নৈকট্য ও তাঁর বান্দা হিসেবে তাঁর করুণা মানুষের কত প্রয়োজন তাও এই সময়েই গভীরভাবে অনুভূত হয়। তার কারণ প্রার্থনাকালেই মানুষ উপলব্ধি করে আল্লাহর কাছে সে কত দুর্বল ও কত ক্ষুদ্র এবং বুঝতে পারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে না। প্রার্থনায়

আন্তরিকতা ও অকপটতা নির্ভর করে, প্রার্থনাকারী কতটা অসহায় বা দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নিপতিত তার উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সকলেই প্রার্থনা করে শান্তির জন্যে। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে দিশেহারা লোকের শান্তির জন্যে প্রার্থনা হবে বহুগুণ বেশি আন্তরিক ও ঐকান্তিক। অনুরূপে, ঝোড়ো হাওয়ায় নদীবক্ষে নৌকোযাত্রী বা বিপদগ্রস্ত উড্ডীন বিমানযাত্রী আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করবে সর্বান্তঃ করণে ; পরম অকপট, বিনয়ী ও বশ্য হবে কৃপা ভিক্ষায়। এ বিষয়ে একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

> "বলুন ঃ 'ভূমি ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে কে তোমাদের উদ্ধার করছে ? তাঁর কাছে বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে প্রার্থনা করো ঃ "আপনি যদি এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তাহলে আমরা সত্যিকারভাবে আপনার শুকর গুজার করবো।"
>
> — সূরা আল-আন'আম ঃ ৬৩

কুরআনে আল্লাহ্ মানুষকে আদেশ করছেন বিনয়নমিত ভংগীতে প্রার্থনা করতে ঃ

> "আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো সবিনয়ে, সঙ্গোপনে। সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না তিনি।
>
> —সূরা আল-আরাফ ঃ ৫৫

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলছেন ঃ বিপন্ন ও নির্যাতিতদের ডাকে সাড়া দেন তিনি ঃ

> বিপন্নদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের মুসিবত দূর করে যে সে তিনিই, এবং তিনিই তোমাদের করেছেন পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ আছে কি ? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।
>
> —সূরা আন-নামল ঃ ৬২

সন্দেহ নেই, আল্লাহর কাছে প্রার্থনার জন্যে তথা প্রয়োজনে তাঁর কৃপাভিক্ষার জন্যে মৃত্যুর মুখোমুখী অবস্থার মতো বিপন্ন হবার দরকার নেই। এই দৃষ্টান্তগুলি দেবার উদ্দেশ্য হলো আন্তরিক প্রার্থনার আকারটুকু ধরিয়ে দেবার জন্যে, আর শেষের সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা স্মরণ করার জন্য যখন

মৃত্যুর মুহূর্ত সমুপস্থিত— সেই অন্তিম লগ্নের কথা ভাবার জন্যে যখন কেউ আর অন্যমনস্ক থাকতে পারে না, বরং সুনিশ্চিতভাবেই সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফেরায়। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌তে সমর্পিত লোকেরা নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থেকে ও অন্তরের আকুতি অনুভব করে সব সময়ই আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় নিয়োজিত হন, কোনরূপ জীবন-মৃত্যু সঙ্কটের জন্য অপেক্ষা করেন না। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটিই অবিশ্বাসী ও অন্ধবিশ্বাসীদের থেকে তাঁদের পার্থক্য নির্দেশ করে।

প্রার্থনায় কোন সীমারেখা নেই

অনুমোদনযোগ্যতার আওতায় হালাল বলে বিবেচিত যেকোন বস্তুর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যায়। এর কারণ, ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক ও শাসক ; তিনি ইচ্ছে করলে, মানুষ যা চায় তা-ই দিতে পারেন। আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার সময় প্রত্যেকেরই উচিত আল্লাহর যদৃচ্ছা কর্মশক্তিকে সমীহ্ করা এবং প্রিয়নবী মুস্তাফা (সঃ) যেমন বলেছেন, "আত্মনিবেদনে দৃঢ় হওয়া"।[২]

প্রত্যেকের জানা উচিত যে আল্লাহর জন্যে মানুষের যেকোন ইচ্ছা বা কামনা পূরণ করা অতি সহজ কাজ, এবং তার প্রার্থনার মধ্যে তার জন্যে কল্যাণকর যদি কিছু থাকে আল্লাহ্ অবশ্যই তা মঞ্জুর করবেন। নবীদের ও প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিদের যে সব প্রার্থনার কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে আল্লাহর কাছে মানুষ কি কি বিষয়ে প্রার্থনা করতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তেমনি একটি উদাহরণ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে নবী যাকারিয়া (আঃ) একটি মনোতোষ উত্তরাধিকারী প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, তাঁর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও ঃ

> যখন তিনি তাঁর রবের কাছে সঙ্গোপনে প্রার্থনা করে বলেন, "হে আমার রব! আমার দেহের অস্থিপঞ্জর হৃতবল, আমার মস্তক শুভ্রতায় আচ্ছাদিত, কিন্তু, আপনার কাছে যতবার প্রার্থনা করেছি আমাকে বিমুখ করেননি। আমার মৃত্যুর পরে আমার আত্মীয়দের

(আচরণ) সম্পর্কে আমার ভয় হয়, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব আমাকে আপনার কাছ থেকে একটি উত্তরসূরী দিন যে আমার উত্তরাধিকারী হবে, অধিকন্তু ইয়াকুবের বংশেরও উত্তরাধিকারী হবে এবং হে আমার রব! তাকে আপনার আদরণীয় করুন।'

—সূরা মারিয়াম ঃ ৩-৬

আল্লাহ্ নবী যাকারিয়ার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং তাঁকে জানান নবী জন (য়াহ্য়া)-এর শুভ সংবাদ ; পুত্র-সন্তান লাভের সুসংবাদে চমকিত হন নবী যাকারিয়া, কেননা তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। নবী যাকারিয়ার প্রশ্নের যে জবাব আল্লাহ দিয়েছিলেন তাতে যে রহস্যের উন্মোচন হয় তা বিশ্বাসীদের জন্য সর্বক্ষণ স্মরণযোগ্য। যাকারিয়া বললেন, 'হে আমার রব! আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি অতি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত, তবু আমার পুত্র-সন্তান কি করে হবে ?" আল্লাহ্ বললেন, 'তবুও তাই হবে! "ওটা আমার জন্যে সহজ কাজ। ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।"

—সূরা মারিয়াম ঃ ৮-৯

কুরআনে আরো অনেক নবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে যাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নবী নূহ্ (আঃ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন তাঁর কওমের ওপর গজব নাজিল করতে, কেননা তাদের সৎপথে চালাবার জন্য তাঁর প্রাণান্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে তারা বিপথগামী হয়েছিলো। প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ্ তাদের (নূহের কওমের) ওপর যে ভয়াবহ্ গজব নাজিল করেছিলেন তা ইতিহাসবিশ্রুত হয়ে আছে।

নবী আইউব (আঃ) একটি যাতনার কারণে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এই বলে ঃ "....চরম যাতনায় পীড়িত আমি, আর তুমি হচ্ছ করুণাময়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা করুণাময়।" —সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৩। তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দেবার কথা বলা হয়েছে এভাবে ঃ

আমাদের থেকে প্রত্যক্ষ অনুকম্পা স্বরূপ এবং এবাদতকারীদের প্রতি অনুকম্পাস্বরূপ, তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে আমরা তাঁর থেকে যাতনা দূর করি, তাঁর পরিবারকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিই এবং তাদের থেকেও যাতনা দূর করি।

—সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৪

আল্লাহ্তায়ালা নবী সুলাইমান (আঃ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কুরআনে বর্ণিত আছে, নবী সুলাইমান প্রার্থনা করেন ঃ "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন একটি রাজ্য দান করুন যার সমতুল্য কোন রাজ্য আমার পরে আর কাউকে দান করা হবে না। নিশ্চিয়ই আপনি পরম দানশীল।" —সূরা সা'দ ঃ ৩৫। আল্লাহ্ তাঁকে প্রবল পরাক্রম ও প্রভূত সম্পদ দান করেন।

যারা প্রার্থনা করে তাদের মনে রাখতে হবে এই আয়াতটি ঃ "কোন কিছু অস্তিত্বে আনয়নে তাঁর ইচ্ছে হলে তাঁর আদেশ হচ্ছে শুধু এটুকু বলা, 'হও'। —সূরা ইয়া-সিন ঃ ৮২। সবকিছুই সহজ আল্লাহর কাছে ; তিনি শোনেন ও জ্ঞাত হন প্রতিটি প্রার্থনা।

যারা ইহকালে সুখ সম্পদ চায় সে-সব তাদের দান করেন আল্লাহ্

কিন্তু পরকালে তারা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

যাদের হৃদয় আল্লাহ-ভীরুতায় দৃঢ়বদ্ধ নয় এবং পরকালে যাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস নেই তাদের বাসনা-কামনা হয় ইহ-জাগতিক। তারা কেবল এই দুনিয়ায় ধনদৌলত ও মান-মর্যাদা কামনা করে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ যারা কেবল এই দুনিয়া চায় আখেরাত তারা পাবে না। অপরপক্ষে, বিশ্বাসীরা কেবল ইহ-সংসারের জন্যে নয় পরকালের জন্যেও আল্লাহ্র আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন ইহজীবনের মতোই নিশ্চিত ও নিকটবর্তী পরকালের জীবন। এই প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> কিছু লোক বলে, 'হে আমার রব! জগতে আমাদের সমৃদ্ধি দাও। তারা পরকালে কোন অংশ পাবে না। এবং অন্যরা বলে, 'হে আমার রব! আমাদের এ জগতে সমৃদ্ধি দাও, এবং সমৃদ্ধি দিও পরকালেও, আর আমাদের রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন থেকে।' তারা তাদের অর্জনের একটা ভালো অংশ পাবে। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ২০০-২০২

ঈমানদার ব্যক্তিগণও সুস্বাস্থ্য, সম্পদ, জ্ঞান ও আশীর্বাদের জন্যে প্রার্থনা করেন কিন্তু তাঁদের সকল প্রার্থনার মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধান ও ধর্ম (দ্বীন)-

এর কল্যাণে কিছু করার অভিপ্রায় থাকে। যেমন, তাঁরা সম্পদ চান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্যে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত নবী সুলাইমান (আঃ)-এর দৃষ্টান্তটি প্রণিধানযোগ্য। নবী সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর কাছে অভূতপূর্ব রাজ্য ও সম্পদ চেয়েছিলেন কোন জাগতিক লোভ ও মোহ চরিতার্থ করার জন্যে নয় বরং সবকিছুই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মহান উদ্দেশ্যে, মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে দাওয়াত করার জন্যে এবং নিজেকে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল রাখার সামর্থ্য লাভের জন্যে। কুরআনে নবী সুলাইমান (আঃ)-এর জবানীতে তাঁর এই আন্তরিক অভিপ্রায়ের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। কুরআনে তার উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

> "........... সত্যই আমি সম্পদের কামনা ভালোবাসি, আমার রবের গৌরব বৃদ্ধির মানসে।"
>
> —সূরা সা'দ ঃ ৩২

আল্লাহ্ সুলাইমান (আঃ)-এর এই প্রার্থনাটিই মঞ্জুর করেন, ইহকালে অপার বৈভব ও পরকালে অশেষ নিয়ামত দান করেন তাঁকে। পক্ষান্তরে, যারা কেবল এই জীবনের বাসনা কামনায় মত্ত আল্লাহ্ তাদের ইচ্ছাও পূরণ করেন কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। এই জীবনে যে নিয়ামত তারা লাভ করেছে পরকালে তা পাবে না তারা।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

> যদি কেউ পরকালে প্রাপ্তির এবাদত করে, আমরা তার প্রাপ্তি বৃদ্ধি করব। যদি কেউ ইহজগতে প্রাপ্তির কামনা করে, আমরা তাকে এর কিছু অংশ দেব কিন্তু পরকালে সে কোন অংশ পাবে না।
>
> —সূরা আশ শুরা ঃ ২০

> এই ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বই যাদের কাম্য তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ঃ আমরা যখন যাকে যা ইচ্ছে করি অতি দ্রুত প্রদান করি। তারপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করি, যেখানে সে দগ্ধ হয়, তিরস্কৃত হয় এবং বিতাড়িত হয়।
>
> —সূরা আল-ইসরা ঃ ১৮

আল্লাহ তাদের ওপর তাঁর নিয়ামত বৃদ্ধি করেন যারা কৃতজ্ঞ

প্রত্যেকেই জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। নিঃশ্বাসের বায়ু থেকে ক্ষিদের খাদ্য, দুই হাতে কাজ করার শক্তি থেকে চিন্তাপ্রকাশের বাকশক্তি, নিছক আশ্রয়লাভ থেকে আনন্দময় অস্তিত্ব— সবকিছুর জন্যে, সব অবস্থার জন্যে আমরা সকলে আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর দানের উপর নির্ভরশীল। অথচ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জানে না তারা কত দুর্বল ও আল্লাহর ওপর কত নির্ভরশীল।

তারা মনে করে চরাচরের বস্তুপুঞ্জ নির্বিশেষে স্বতোৎসারিত কিংবা সবকিছুই তারা পাচ্ছে নিজের চেষ্টায়। এটি একটি মস্ত বড় ভুল এবং আল্লাহর প্রতি মারাত্মক কৃতঘ্নতা। আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষ অতি নগণ্য উপহারের জন্যও উপহারদাতাকে ভুরি ভুরি ধন্যবাদ জানাতে ভোলে না, অথচ জীবনভর বেশুমার নিয়ামত পেয়েও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না। মানুষের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এমন বিপুল যে সে কখনো তা গুণে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ এই বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন একটি আয়াতে ঃ

> তোমরা চেষ্টা করলেও কখনো আল্লাহর নিয়ামতসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। আল্লাহ্ চির-ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।
>
> —সূরা আন-নাহল ঃ ১৮

তা সত্ত্বেও, অধিকাংশ লোক আল্লাহর কোন নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এর কারণ নির্দেশ করা হয়েছে কুরআনে ঃ শয়তান, যার প্রতিজ্ঞা হলো মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করা, সে বলেছে যে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ করা। আল্লাহর প্রতি শয়তানের উদ্ধত উক্তিগুলোই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গুরুত্ব নির্দেশ করে ঃ

> "তখন আমি তাদের কাছে আসবো, তাদের সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে। দেখবেন তাদের অধিকাংশই নাফরমান। তিনি (আল্লাহ্) বলেন, 'দূর হ' তুই ধিকৃত ও

> বিতাড়িত জন। যারা (মানবজাতি) তোর অনুসরণ করে তাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে জাহান্নাম ভরাট করবো আমি।'
>
> —সূরা আল-আরাফ ঃ ১৭-১৮

অপরপক্ষে বিশ্বাসীরা তাঁদের দুর্বলতা ও আল্লাহর সম্মুখে তাঁদের দীনতার বিষয়ে সচেতন হয়ে আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ধন-সম্পদই একমাত্র নিয়ামত নয় যার জন্য ঈমানদাররা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। আল্লাহই সবকিছুর মালিক ও অধিকারী জেনে ঈমানদাররা তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবোধ করেন তাঁদের সুস্বাস্থ্য, সুষমা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধর্মপ্রীতি, অধর্ম বিদ্বেষ, সমঝদারিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি ও ক্ষমতার জন্য। তারা কৃতজ্ঞ ঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্যে এবং ঈমানদারদের দলে অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্যে। মনোরম ভূদৃশ্য, তাঁদের বিষয়াদির সহজ ব্যবস্থাপনা, তাঁদের ইচ্ছার পূরণ, তাদের জন্য সুসংবাদ শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ বা অন্য যে কোন নিয়ামত ঈমানদারগণকে প্রণোদিত করে অবিলম্বে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং আল্লাহর করুণা ও অনুকম্পার বিষয়ে চিন্তা করতে।

সুন্দর নৈতিক জীবনের কারণে ঈমানদারদের জন্যে অপেক্ষা করছে পুরস্কার। এটিই হচ্ছে কুরআনে উন্মোচিত রহস্যাবলীর অন্যতম একটি। যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ্ তাদের জন্য নিয়ামত বৃদ্ধি করেন। যথা ঃ যারা সুস্বাস্থ্য ও সামর্থের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আল্লাহ্ তাঁদের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য আরও উন্নত করে দেন। জ্ঞান বা ধন-সম্পদের জন্য যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ্ তাঁদের জ্ঞান ও ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দেন। এর কারণ হচ্ছে তাঁরা আল্লাহ যা' দিয়েছেন তাতে তুষ্ট, আল্লাহর নিয়ামত লাভে আপ্লুত এবং তারা আল্লাহ্‌কে পরমমিত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ কুরআনে এ রহস্য উন্মোচন করছেন এভাবে ঃ

> আর যখন তোমার রব ঘোষণা করলেন ঃ "যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই তোমার শ্রীবৃদ্ধি করে দেব, কিন্তু যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার দন্ড হবে কঠিন।"
>
> —সূরা ইবরাহিম ঃ ৭

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা তাঁর নৈকট্য ও ভালোবাসারই একটি নিদর্শন। যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য ও আশীর্বাদ উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি তাদের আছে। আল্লাহর রাসূল (সঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

যখন আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদ দান করেন তখন আল্লাহর নিয়ামত ও রহমতের আনন্দময় অভিব্যক্তি তোমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।[৩]

পক্ষান্তরে, একজন অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি এমনকি সর্বাধিক মনোরম পরিবেশের মধ্যেও ত্রুটি ও অপূর্ণতা আবিষ্কার করে অতৃপ্ত ও অসুখী হবে। বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির ঐশী উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই এ সকল লোক সব সময়ে আপাত প্রতিকূল ঘটনা ও অপ্রীতিকর দৃশ্যাবলীর সম্মুখীন হয়। অপিচ আল্লাহ্ তাদেরই অধিকতর রহমত ও নিয়ামত প্রদান করেন যারা আন্তরিক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাবের অধিকারী।

আল্লাহ্ যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের প্রতি তাঁর নিয়ামত বৃদ্ধি করেন এটাই হচ্ছে কুরআনের অন্যতম রহস্য। তবে মনে রাখতে হবে যে কৃতজ্ঞতার পূর্বশর্ত হচ্ছে, আন্তরিকতা। আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ না করে এবং আল্লাহর অশেষ করুণা ও অনুকম্পাজনিত অন্তরের শান্তি উপলব্ধি না করে আল্লাহর প্রতি লোক দেখানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চরম আন্তরিকতাহীনতা তথা ভন্ডামিরই নামান্তর। আল্লাহ্ জানেন প্রতিটি হৃদয়ের প্রবৃত্তি কি। ভণ্ডামি লুকাবে কোথায়? মনের অসৎ উদ্দেশ্যগুলো অন্যদের কাছ থেকে লুকানো যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে নয়। এ ধরনের লোকেরা সুদিনে জাঁকজমক করে কৃতজ্ঞতার প্রদর্শনী করতে পারে কিন্তু দুঃসময়ে খুব সহজেই তারা অকৃতজ্ঞতায় পতিত হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রকৃত ঈমানদার যারা, তারা কঠিনতম পরিস্থিতিতেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। বাহ্য দৃষ্টিতে কারও মনে হতে পারে, ঈমানদারদের উপভোগ্য নিয়ামত কিছুটা হ্রাস পেল বুঝি। কিন্তু ঈমানদাররা যেহেতু সকল ঘটনা ও পরিস্থিতির ভালো দিকটা উপলব্ধি করতে পারেন তারা এই পরিস্থিতির মধ্যেও মঙ্গল দেখতে পান। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তিনি মানুষকে পরীক্ষা করবেন ভীতি, বুভুক্ষা বিত্তহ্রাস, এমনকি, প্রাণহানির মধ্য দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে ও এমতাবস্থায় ঈমানদাররা আনন্দিত হন ও কৃতজ্ঞতাবোধ করেন এবং আশা করেন যে, পরীক্ষায় তাঁদের প্রদর্শিত দৃঢ়চিত্ততা ও একাগ্রতার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদের বেহেশতের উপঢৌকন দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। তাঁরা জানেন আল্লাহ্ কারও কাঁধের উপর তার বইবার শক্তির অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। এই একাগ্রতা ও সচেতনতা তাদেরকে সহিষ্ণুতা ও কৃতার্থতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। অবিচল নিষ্ঠা ও আত্মসমর্থনই হচ্ছে ঈমানদারদের একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ। আর আল্লাহর বিঘোষিত প্রতিজ্ঞা হচ্ছে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের ওপর ইহকাল ও পরকালে তাঁর অশেষ নিয়ামত বর্ষণ।

ভাগ্যের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া ও আল্লাহ্‌তে পূর্ণ ঈমান স্থাপনের গোপন রহস্য

প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর শক্তি ও নৈকট্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা যাদের আছে আল্লাহ্‌তে পূর্ণ ঈমান তাঁদেরই একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্‌তে ঈমান স্থাপনের অনুষঙ্গী কতিপয় গোপন রহস্য ও নিয়ামত রয়েছে। আল্লাহ্‌তে ঈমান স্থাপনের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আনুগত্য এবং তাঁর ওপর ও তিনি যে ভাগ্য গড়ে দেন তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া। আল্লাহ্‌ সকল সত্তার স্রষ্টা—মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা ও জড়বস্তু সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন তিনি। সকল সৃষ্টিরই একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য ও ভাগ্য বিধান রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, সমুদ্র, হ্রদ, বৃক্ষলতা, ফুলফল, ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকা, পতনশীল একটি বৃক্ষপত্র, আপনার ডেস্কের ওপর একটি ধূলিকণা, যে উপখণ্ড মাড়িয়ে আপনি হোঁচট খেলেন, বছর দশেক আগে আপনি যে জামাটি কিনেছিলেন, আপনার রেফ্রিজারেটরে রক্ষিত পীচফল, আপনার মা, আপনার বাবা, আপনার আত্মীয়-স্বজন, আপনার স্কুল জীবনের বন্ধুবর্গ, এবং স্বয়ং আপনি—সকল জীব ও জড় বস্তুরই নিজস্ব ভাগ্য লিপি রয়েছে যা লক্ষ-কোটি বছর আগে আল্লাহর দৃষ্টিতে পূর্বনির্ধারিত। প্রত্যেকেরই ভাগ্যলিপি লেখা আছে একটি কেতাবে, কুরআনে যাকে বলা হয়েছে উম্মুল কেতাব বা "কেতাবের মা"। মৃত্যুর মুহূর্ত, পাতাটি ঝরে পড়ার মুহূর্ত, আপনার ফ্রিজে রাখা পীচফল নষ্ট হতে শুরু করার মুহূর্ত এবং আপনি যে শিলাখণ্ডে হোঁচট খেলেন সেটির, সকল স্তরের বর্ণনা সংক্ষেপে, ক্ষুদ্র-বিশাল নির্বিশেষে সকল বস্তু ও বিষয়ের ভবিতব্যই লেখা আছে এই কেতাবে।

ঈমানদাররা ভাগ্যে বিশ্বাস করেন। তাঁরা জানেন আল্লাহ্‌ তাঁদের যে- ভাগ্য নির্মাণ করেছেন তাঁদের জন্যে তা-ই শ্রেষ্ঠ। সে কারণেই তাঁদের জীবনের প্রতি মুহূর্তেই তাঁরা আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রাখেন। তাঁরা জানেন আল্লাহ সবকিছুই সৃষ্টি করেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারে, এবং আল্লাহর সকল

সৃষ্টিতেই কল্যাণ নিহিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, নির্মম-নিষ্ঠুর শত্রুর সম্মুখীন হওয়া, নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, অথবা কল্পনাতীত ভয়ঙ্করতম পরিস্থিতিতে নিপতিত হওয়ার মতো প্রাণান্তকর দুর্বিপাকেও তাঁরা থাকেন অবিচলিত। কোন রকম ভয়ভীতি তাঁদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে পারে না। আল্লাহ তাঁদের জন্যে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তাকে তাঁরা স্বাগত জানান। বিশ্বাসীরা যে-সব পরিস্থিতি মোকাবেলায় আনন্দ পান অবিশ্বাসীরা সেগুলোতে ভীতিবিহবল কিংবা হতাশাগ্রস্ত হয়। কারণ পূর্বে ভয়ঙ্করতম পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তাঁদের পরীক্ষা করার জন্যে। এই সকল পরিস্থিতিতেও আল্লাহর প্রতি যাদের একাগ্রতা অবিচলিত থাকে, আল্লাহ্‌তে ঈমান অটুট থাকে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ যে ভাগ্য নির্মাণ করেছেন প্রসন্ন চিত্তে তা বরণ করেন তাঁরা আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন করেন। তাঁরা চিরকালের জন্য বেহেশত্ হাসিল করেন। সুতরাং ঈমানদাররা সারাজীবন আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপনের আনন্দ ও আরাম উপভোগ করেন। এটি একটি গোপন রহস্য যা আল্লাহ ঈমানদারদের কাছে আশীর্বাদরূপে উন্মোচন করেন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন তিনি তাদের ভালোবাসেন যারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। —সূরা আল-ইমরান ঃ ১৫৯ এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মন্তব্যটিও স্মরণযোগ্য ঃ

> আল্লাহর কোন বান্দাই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যদি না সে ভালো ও মন্দ উভয়দিকসহ ভাগ্যকে বিশ্বাস করে এবং যদি না সে পরিজ্ঞাত থাকে যে, তার ওপর আপতিত (ভালো বা মন্দ) কোনকিছুই সে নিরোধ করতে পারবে না এবং যা কিছু (ভালো বা মন্দ) তাকে এড়িয়ে যায় তা সে ধরতে পারবে না।[৪]

আল্লাহতে ঈমান স্থাপনের প্রসঙ্গে কুরআনে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "ব্যবস্থা গ্রহণ"। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঈমানদাররা কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সে সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে। বহু আয়াতে আল্লাহ এই রহস্যটি উন্মোচন করেছেন যে ওই সব ব্যবস্থা এবাদতেরই একটি রূপ বলে আল্লাহ্ গ্রহণ করলেও সেগুলো ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। নবী ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে শহরে প্রবেশের সময় কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ

দেন কিন্তু পরে তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

> তিনি বললেন, 'বাছারা, তোমরা সবাই এক দরজা দিয়েই ঢুক্তে যেও না, কোনক্রমেই না। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ফটক দিয়ে ঢুকো। তবে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র হাত থেকে আদৌ বাঁচাতে পারবো না, কেননা বিচারের রায় কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসবে, অন্য কারও কাছ থেকে নয়।'
>
> —সূরা ইউসুফ ঃ ৬৭

নবী ইয়াকুবের বক্তব্য থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, বিশ্বাসীরা অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করেন, কিন্তু তাঁরা জানেন যে আল্লাহ্ তাঁদের জন্য যে ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা তাঁরা পরিবর্তন করতে পারবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন যানচালকের উচিত যানচলাচল বিধি মেনে চলা এবং অসাবধানে ড্রাইভ না করা। এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা এবং নিজের ও অন্যদের জীবনের জন্য এবাদতেরই একটি রূপ। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছে যদি এই হয় যে, গাড়ি দুর্ঘটনায়ই ঐ লোকের মৃত্যু হবে তাহলে কোন ব্যবস্থাই তার অপঘাত মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না। কখনো এমন প্রতীয়মান হতে পারে যে কোন বিশেষ কাজ বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তার সম্পূর্ণ জীবনধারাই পাল্টে গেছে, অথবা কোন ব্যক্তি নিছক মনের জোর আর সহ্য গুণ দিয়েই কোন কালব্যাধির আক্রমণ থেকে আরোগ্য লাভ করেছে। কিন্তু এসবই হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে। কেউ কেউ এসব ঘটনাকে ভুল বুঝে বলে "ভাগ্যকে অতিক্রম করা হয়েছে" বা "ভাগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে।" কিন্তু কেউ, জগতের বলবত্তম ও পরাক্রান্ততম ব্যক্তিও আল্লার বরাদ্দ রদ করতে পারে না। কোন মানুষেরই সে শক্তি নেই। আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে সব সৃষ্টিই দুর্বল। কিছু লোক তা বিশ্বাস করে না, তাতে সত্যের কোন অপলাপ ঘটে না। তারা যে ভাগ্যকে অস্বীকার করে সেটাও আল্লাহর ইচ্ছারই পরিপূরণ। সে কারণেই যারা মৃত্যু বা কালব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে বা যাদের

জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে তাদের ভাগ্যলিপিতে অনুরূপ ভবিতব্যই লেখা ছিল, সুতরাং তা-ই ঘটেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ঃ

> পৃথিবীতে বা তোমার মধ্যে এমন কিছুই ঘটে না যা আমরা ঘটাবার আগে ভাগ্যলিপিতে লেখা ছিল না। আল্লাহর জন্যে এটা সহজ। এ সবকিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা যেন তোমাদের এড়িয়ে যাওয়া বস্তু নিচয়ের জন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত না হও কিংবা তোমাদের আয়ত্তে আসা বস্তুনিচয়ের জন্য অতি-উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ স্পর্ধিত বা আত্মম্ভর ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।
>
> —সূরা আল-হাদিদ ঃ ২২-২৩

উদ্ধৃত আয়াতের বয়ান অনুসারে, যা কিছু ঘটে তা পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর নজরে রক্ষিত কেতাবে পূর্ব-লিখিত। তাই আল্লাহ মানুষকে বলেন যা হারিয়ে গেছে তার জন্য বেদনাবিদ্ধ না হতে। উদাহরণতঃ কোন লোক যদি অগ্নিকান্ডে বা ব্যবসায় বিপর্যয়ে সর্বস্ব হারায় তাহলে বুঝতে হবে এটাই ছিল তার জন্যে বিধিলিপি ; এটা রোধ করা বা এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। কাজেই এই ক্ষতির জন্যে ক্ষোভ হবে নির্বুদ্ধিতা। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের পূর্ব-নির্ধারিত ঘটনাবলী সংঘটন দ্বারা পরীক্ষা করেন। এ রকম পরীক্ষাকালে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাসে অটল থাকেন তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সপ্রেম করুণা লাভ করেন আর যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে না তারা ইহকালে জীবনভর দুঃখ তাপে বেদনা অস্থিরতায় দীর্ন হবে এবং পরকালে অনন্তজীবন শাস্তিভোগ করবে। এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই পরম শান্তি ও কল্যাণ লাভ হবে। ঈমানদারদের কাছে এসব রহস্য উন্মোচন করে আল্লাহ্ তাঁদের নানাবিধ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশ করেছেন এবং ইহজীবনে তাঁদের পরীক্ষা সহজ করে দিয়েছেন।

প্রত্যেক ঘটনায় অন্তর্নিহিত আছে কল্যাণ

আল্লাহ আমাদের পরিজ্ঞাত করছেন তিনি প্রত্যেক ঘটনাই সংঘটিত করেন সেই ঘটনায় অন্তর্নিহিত কল্যাণসহ। এটি হচ্ছে আরেকটি গোপন রহস্য যা আল্লাহ্‌তে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন মানুষের জন্য সহজ করে দেয়। আল্লাহ্ বলেন এমনকি যেসব ঘটনা প্রতিকূল বলে প্রতীয়মান হয় তাদের মধ্যেও প্রচুর কল্যাণ নিহিত থাকে ঃ

> ....এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু বিষয় অপছন্দ কর যার মধ্যে আল্লাহ প্রচুর কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ১৯

> ....এমন হতে পারে যে তোমরা এমন কিছু ঘৃণা কর যা তোমাদের জন্য শুভ, এবং এমন হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু ভালোবাস যা তোমাদের জন্য অশুভ। আল্লাহ্ জানেন। তোমরা জানো না।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৬

এই রহস্য সম্পর্কে অবহিত বলে ঈমানদাররা প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই শুভ ও শোভার সন্ধান করেন। কোন আপাত বিরূপ ঘটনা, সঙ্কট বা বিপর্যয়ে তাঁরা পীড়িত বা বিহবল হন না। দুর্যোগটি তুচ্ছ হোক কিংবা মারাত্মক, যা-ই হোক না কেন, তাঁরা অবিচলিত থাকেন। সাচ্চা মুসলমানেরা এমনকি তাঁদের কষ্টার্জিত সমুদয় বিত্তবৈভব হারিয়ে সেই চরম রিক্ততার মধ্যেও কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে পান। তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে জীবন উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ্ হয়তো তাঁদেরকে কোন দুষ্কার্য সম্পাদন অথবা সম্পদের অতিরিক্ত মোহবন্ধন থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান কেননা এ জগতের কোন ক্ষতিই পরকালের ক্ষতির সমতুল্য নয়। পরকালের ক্ষতি মানে অনন্ত ও অসহ্য শাস্তি। যারা পরকাল তথা অনন্ত জীবনের কথা স্মরণে রাখেন তাঁরা প্রতিটি ঘটনাকেই বিবেচনা করেন সুন্দর ও কল্যাণের আকর হিসেবে, যা পরকালের পাথেয়। এসব বিপর্যয়ে অটল থেকে তাঁরা আল্লাহর সম্মুখে

নিজেদের অসহায়তা উপলব্ধি করেন এবং তাঁরা যে কতটা আল্লাহর মুখাপেক্ষী তা-ও উপলব্ধি করেন। তাঁরা আল্লাহর কাছে আরো নমিত হৃদয়ে প্রার্থনা করবেন এবং সে-প্রার্থনা তাঁদেরকে আল্লাহর আরো নৈকট্যে নিয়ে আসবে। এতে নিশ্চিতই পরকালের বিরাট মোক্ষলাভ ঘটবে। এসব ছাড়াও, আল্লাহতে পূর্ণ ঈমান রেখে ও একাগ্রতা প্রদর্শন করে তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন এবং আল্লাহর অফুরান রহমতে অভিষিক্ত হবেন।

শুধু সঙ্কট বা বিপর্যয়ের মধ্যেই নয়, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মধ্যেও কল্যাণ ও সৌন্দর্যের সন্ধান করা উচিত। যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তি অনেক শ্রম দিয়ে সুখাদ্য প্রস্তুত করার পর দুর্ভাগ্যক্রমে তা পুড়িয়ে ফেলে এমন কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যার ফলে ভবিষ্যতে আরো বড় ও মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আল্লাহর ইচ্ছায় তিরোহিত হল। একজন যুবক এমন একটি ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হলো যার ওপর নির্ভর করছিল তার ভবিষ্যতের অনেক আশা। হতাশ না হয়ে তার বরং ভাবা উচিত এই ব্যর্থতার মধ্যেও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতের কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি বা বৈরী ব্যক্তির কোপানল থেকে তাকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর হয়েছে তার ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে—এই ভেবে তার সন্তুষ্টই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়েই দৃশ্য ও কল্পনাতীত অনেক নিয়ামত বর্ষণ করেন এই কথা ভেবেই ঈমানদাররা আল্লাহর পথনির্দেশের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

কোন ঈমানদার ব্যক্তিও হয়তো সব সময় সব ঘটনার পেছনে কল্যাণ ও স্বর্গীয় অভীষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিশ্চিত জানেন সকল ঘটনার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন সকল ঘটনার পেছনে যে কল্যাণ রয়েছে তা তাকে দেখিয়ে দিতে।

আল্লাহর সৃষ্ট জগতে সকল সৃষ্টির পেছনেই যে একটি উদ্দেশ্য আছে এ বিষয়ে যারা অবহিত তাঁরা কখনো বলেন না, "আগে জান্‌লে কি আর একাজ করি আমি!" কিংবা "আগে জানলে ও-কথা মুখেও আনতাম না।" ইত্যাদি। ভুল-ত্রুটি ও আপাত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, সবকিছুর মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে অন্তর্গত উপাদানরূপে, আর এগুলো সবই হচ্ছে ভাগ্যের পরীক্ষা। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রণীত ভাগ্যলিপির মাধ্যমে মানুষকে জরুরী শিক্ষা ও তাগিদ দেন আল্লাহ। যারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মূল্যায়ন সক্ষম তাঁরা প্রতীয়মান ভুল বা বিপর্যয়কে দেখেন শিক্ষা, হুঁশিয়ারী ও আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রজ্ঞার

প্রকাশরূপে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন মুসলিম তাঁর বিপণীভবন অগ্নিদগ্ধ হলে আত্মানুসন্ধানে নিয়োজিত হবেন। তাঁর বিশ্বাসে আরও আন্তরিক ও দৃঢ় হবেন এবং এই বিপর্যয়কে জাগতিক সুখ ও বিত্ত-বৈভবের মোহবন্ধনের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত একটি হুঁশিয়ারীরূপে গ্রহণ করবেন।

ইহজীবনে যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন একদিন তার অবসান হবেই। কোন ব্যক্তি কোন অতীত ভোগান্তির কথা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখবেন যে ভোগান্তিটি এখন তাঁর মনে একটি স্মৃতিমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। মানুষ কোন ছায়াছবির দৃশ্যাবলীও এভাবেই স্মরণ করে। কাজেই যেকোন বিপর্যয় সম্পর্কেই বলা যায়, এমন একদিন আসবে যখন এই বেদনাতুর অভিজ্ঞতা স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হবে একটি ছায়াছবির দৃশ্যের মতোই। কেবল একটি বিষয়ই থেকে যাবে ঃ বিপদকালে আক্রান্ত ব্যক্তি কি মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহ তাতে তুষ্ট হয়েছিলেন কিনা। মানুষকে তার অভিজ্ঞতার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না, কিন্তু তার অভিজ্ঞতাকালীন মনোভাব, চিন্তা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হবে।

সুতরাং আল্লাহ সৃষ্ট সকল পরিস্থিতির মধ্যে কল্যাণ ও ঐশী আশীর্বাদ দর্শনের প্রয়াস একটি ইতিবাচক মনোভাব যা ঈমানদারদের জন্য ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর অপার আশীর্বাদ বয়ে আনবে। এই রহস্যটি যাদের অবগত তাঁরা কোন আসন্ন দুঃখ বা ভয়ের শঙ্কায় শঙ্কিত হন না, কোন ব্যক্তি বা ঘটনা তাঁদের জন্য ইহকাল ও পরকালে কোন ভয়, ক্ষতি বা দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ কুরআনে এই রহস্যটি উন্মোচন করেছেন এভাবে ঃ

> আমরা বললাম, 'এর থেকে নেমে যাও, তোমরা প্রত্যেকে নেমে যাও! তারপর যখন তোমাদের কাছে আমার পথনির্দেশ পৌছায়, (তখন তোমাদের মধ্যে) যারা আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করে তারা কোন ভীতি অনুভব করবে না এবং কোন দুঃখের অনুভূতিও তাদের হবে না।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৮

> হাঁ আল্লাহর মিত্ররা কোন ভয় অনুভব করবেন না এবং কোন দুঃখের অনুভূতিও তাঁদের হবে না ঃ যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেছে তাদের জন্যে ইহজীবনে ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর কথার নড়চড় হয় না। সেটি হচ্ছে মহান বিজয়।
>
> —সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৪

সব মুস্কিলেরই আসান আছে

মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্যই বিশ্বসৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন কখনো নিয়ামত দিয়ে, কখনো কষ্ট। যারা পবিত্র কুরআনের আলোকে ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করতে পারে না তারা ঘটনাবলীর যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না বলে ভগ্নহৃদয়ে হতাশার ডোবাজলে ডুবে যায়। সে যাই হোক, আল্লাহ কুরআনে এমন একটি গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন যা কেবল প্রকৃত ও বিনম্র ঈমানদাররা উপলব্ধি করতে পারেন। রহস্যটি উন্মোচন করা হয়েছে এভাবে ঃ

> কারণ সত্যই মুস্কিলের সাথেই আসে আসান ; সত্যই মুস্কিলের সাথেই আসে আসান।
>
> —সূরা আল- ইনশিরাহ ঃ ৫-৬

বিপদ যে ধরনেরই হোক না কেন এবং তা থেকে উদ্ধার পাওয়া যত দুরূহ বলেই প্রতীয়মান হোক না কেন, ঈমানদারদের জন্য নিষ্কৃতি পাবার পথ তৈরি করে দেবেন আল্লাহ।

বস্তুত বিশ্বাসী যদি অবিচলিত থাকেন তাহলে তিনি দেখতে পাবেন সব মুস্কিলের সঙ্গেই আসান পৌঁছিয়ে দেন আল্লাহ। অন্যান্য আয়াতে খোদাভীরু বান্দাদের জন্যে আল্লাহর নিয়ামত ও রহমতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ

> ...... খোদাভীরু যে খোদা তাকে (বিপদ-মুক্তির) পথ করে দেবেন এবং তার প্রত্যাশার বাইরের স্থান থেকে তার জন্যে সুরাহা করে দেবেন। আল্লাহ্‌তে যে বিশ্বাস স্থাপন করে— আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট...।
>
> —সূরা আত-তালাক ঃ ২-৩

বইবার শক্তি নেই এমন বোঝা কারও ওপর চাপিয়ে দেন না আল্লাহ

পরম করুণাময় সহৃদয় ও ন্যায়বিচারক আল্লাহ সবকিছুর মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন এবং মানুষকে পরীক্ষা করেন তার সামর্থ্যের সীমার মধ্যেই।

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে যে ধরনের প্রার্থনার নির্দেশ দেন, তাকে পরীক্ষা করার জন্যে যেসব দুর্বিপাকের সৃষ্টি করেন এবং যে সকল দায়িত্বে তাকে দায়বদ্ধ করেন সেসবই ব্যক্তিগতভাবে তার সামর্থ্যের অনুপাতেই করে থাকেন। ঈমানদারদের জন্যে এটি একটি সান্ত্বনা ও আশা এবং আল্লাহর করুণা ও অনুকম্পার অভিব্যক্তি। কুরআনে এই রহস্যটি আল্লাহ উন্মোচন করেছেন এই মর্মে ঃ

> এবং এতিমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগে তোমরা তাদের সম্পত্তির কাছে যেও না সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া ; এবং তোমরা ন্যায়-নিষ্ঠতার সঙ্গে পূর্ণ মাপ ও পূর্ণ ওজনে লেনদেন করবে— আমরা কারও ওপরে তার বইবার শক্তির অতিরিক্ত চাপিয়ে দিই না ; এবং তোমরা যখন কথা বলবে তখন নিরপেক্ষ সমদর্শী হবে, এমনকি তোমাদের কোন নিকট-আত্মীয় জড়িত থাকলেও ; এবং তোমরা আল্লাহর ওয়াদা পালন করবে। তা করবার জন্যই তিনি তোমাদের তাগিদ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা আশাপ্রদভাবে মনোযোগ দিয়ে তা শোন।
>
> —সূরা আল-আনআম ঃ ১৫২

> যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের বিষয়ে বলা যায়, আমরা কারও ওপরে তার বইবার শক্তির অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দিই না—তাঁরা জান্নাতী উদ্যানের সাথী, সেখানেই তাঁরা থাকবেন চিরকাল।
>
> — সূরা আল-আরাফ ঃ ৪২

> আমরা কাহারও ওপরে তার বইবার শক্তির অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দিই না। আমাদের সঙ্গে আছে একটি কেতাব যা সত্য উচ্চারণ করে। তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।
>
> —সূরা আল-মুমিনুন ঃ ৬২

আল্লাহর ধর্ম অনুসারে জীবনযাপন সহজ

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করে যে ধর্ম তাদের জীবনকে কঠিন করে তুলবে, তাদের ওপর চাপিয়ে দেবে কঠোর দায়-দায়িত্ব। এটা হচ্ছে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার জন্যে তার কানে কানে শয়তানের কুমন্ত্রণা

(ওয়াসওয়াসা)। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্ম সহজ। আল্লাহ্ বলেছেন বিশ্বাসী মানুষজনের মুস্কিলের পর আসানই হচ্ছে তাঁর অভিপ্রায়। তাছাড়া ধর্মের মৌলিক নীতিমালা যথা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভাগ্যলিপির অমোঘতার উপলব্ধি দুঃখ তাপের কারণ ও সকল বিপদ-আপদ দূর করে। ধর্মের নৈতিকতায় জীবন-যাপন করে যে মানুষ তার কোন দুঃখ-দুর্দশা-হতাশা থাকতে পারে না। বহু আয়াতে আল্লাহ্ তাঁদেরকে সাহায্য করার এবং ইহকাল ও পরকালে তাঁদেরকে সুন্দর জীবন উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ও তাঁর ধর্মকে অনুসরণ করে। আমাদের রব। যিনি কখনো ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার, বলেছেন ঃ

> খোদাভীরুদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়, 'কি প্রেরণ করেছেন তোমাদের রব ?, তাদের জবাব হচ্ছে, 'শুভ!' যারা শুভ কাজ করেন তাঁদের জন্যে পৃথিবী শুভময়, এবং পরকালের নিবাস আরো ভালো। কী অপূর্ব খোদাভীরুদের নিবাস!
>
> —সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৩০

আল্লাহ্ কুরআনে বিশ্বাসীদের এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যারা তাঁর ধর্মের অনুশাসন পালন করবেন তাঁদের কামিয়াব করবেন তিনি ঃ

> যিনি দান করেন (মুক্তহস্তে), আল্লাহ্কে ভয় করেন এবং শুভকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আমরা তাঁর আসানের পথ সুগম করি।
>
> —সূরা আল-লায়ল ঃ ৫-৭

এ রহস্যগুলোতে এই সত্যই উন্মোচন করা হয়েছে যে যিনি আল্লাহর ধর্মে অকৃত্রিমভাবে আত্মনিবেদন করেছেন তিনি সূচনাতেই এমন একটি আসানের পথ বেছে নিয়েছেন যা ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে আশিসধন্য ও সাফল্যমণ্ডিত করবে। অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে পরিণাম হবে বিপরীত। অবিশ্বাসীরা ইতিমধ্যেই দুঃখ-বিষাদময় ও ক্ষতিপূর্ণ জীবন অর্জন করেছে ঃ পরকালও তাদের অনুরূপই হবে। অবিশ্বাসীরা যে মুহূর্তে নাস্তিক্যের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে মুহূর্তেই তারা ইহকাল ও পরকাল দুই-ই খুইয়েছে। বিষয়টি একটি আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে ঃ

যে ব্যক্তি কৃপণ, নিজেকে স্বয়ম্ভর ভাবে এবং শুভকে অস্বীকার করে, আমরা তার মুস্কিলের পথ মসৃণ করে দিই।

—সূরা আল-লাইল ঃ ৮-১০

বিশ্বচরাচরে, সবকিছুর মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ। আল্লাহর বন্ধুত্ব, সাহায্য ও আনুকূল্যই হওয়া উচিত মানুষের পরমারাধ্য। আল্লাহকে যে মিত্ররূপে গ্রহণ করে, এবং তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মনিবেদন করে সে ইহকাল ও পরকালে প্রাচুর্য ও প্রশান্তির মধ্যে বসবাস করবে, কোন সূত্র থেকেই তার জন্যে হানিকর কোন কিছুর উদ্ভব ঘটবে না। এটি একটি অপরিবর্তনীয় সত্য। এই প্রেক্ষিতে প্রাজ্ঞ ও বিবেকবান প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কুরআনে উন্মোচিত এই রহস্যগুলো অনুধাবন করা এবং বিজ্ঞোচিত ও সঠিক পথটি গ্রহণ করা। অবিশ্বাসীরা যে এই পরিষ্কার বিষয়গুলোও বুঝতে পারে না সেটা স্বতঃই আরেকটি রহস্য। যত বুদ্ধিমান ও সুনিশ্চিতই হোক না কেন, তারা, তাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে না, তাই এ বিষয়গুলো দেখতে ও অনুধাবন করতে তারা অক্ষম।

আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের বোধশক্তি অস্পষ্ট করে দেন

কিছু লোক যে কুরআনকে বুঝতে পারে না এটা হচ্ছে কুরআনে উন্মোচিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রহস্যগুলোর অন্যতম। এটা বাস্তবিকই একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন রহস্য, কেননা কুরআন হচ্ছে একটি অতিশয় স্পষ্ট, সহজ ও সরল বক্তব্য সম্বলিত বই। যেকোন ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই কুরআন পড়তে পারেন এবং জানতে পারেন আল্লাহর আদেশমালা, তাঁর সন্তুষ্টি বিধায়ক আদেশমালা, জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও বহু গোপন রহস্য যার কয়েকটি এই বইতে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তবুও কুরআনের পরম স্বচ্ছতা সত্ত্বেও, আল্লাহর অমোঘবিধানে কিছু লোক কুরআনকে বুঝতে পারে না। এরা পারমানবিক প্রকৌশলী বা জীববিদ্যার অধ্যাপক হতে পারেন, বিজ্ঞানের অতীব জটিল শাখাসমূহ— তথা পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বা গণিত এবং বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, শিন্টোবাদ, জড়বাদ বা সাম্যবাদ বুঝতে পারেন। কিন্তু কুরআন কিছুতেই না। তাঁরা কুরআন বহির্ভূত জটিল প্রক্রিয়াগুলো গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আল্লাহর স্বচ্ছ ও সহজ ধর্ম বুঝতে পারেন না, দিবালোকের মত স্পষ্ট বিষয়গুলোও তাঁদের বোধশক্তির উর্ধ্বে থেকে যায়।

স্পষ্টতম বিষয়গুলোও তাদের বুঝতে না পারার এই ঘটনাটিও স্বতঃই একটি রহস্য। তাদের বোধ শক্তির এই মারাত্মক ঘাটতিটি দেখিয়ে দিয়ে আল্লাহ এই কথাটিই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তারা ভিন্ন প্রকৃতির লোক। এর মধ্যে এই সত্যটিরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে সকল হৃদয়, যুক্তি ও বোধশক্তি আল্লাহর হাতে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, যারা আত্মম্ভরিতার অনুভূতিতে আক্রান্ত, অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনে পরাঙ্মুখ, আল্লাহ তাদের হৃদয় ও বোধশক্তি আচ্ছন্ন করবেন। কুরআন ছাড়া আর সবই তারা বোঝে এই ঘটনাটি থেকে আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, তাদের আন্তরিকতাহীনতার কারণে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করেছেন এবং

তারপর তাদেরকে কুরআন থেকে বঞ্চিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত ঃ

> যখন তোমরা কুরআন আবৃত্তি কর তখন আমরা একটা অস্পষ্টতার অন্তরাল সৃষ্টি করি তোমাদের ও যারা পরকালে বিশ্বাসী নয়, তাদের মধ্যে। আমরা তাদের কুরআন অনুধাবনে বাধা দেবার জন্যে তাদের হৃদয় আবরণে আবৃত করেছি, তাদের কানকে করেছি ভারাক্রান্ত। তোমরা যখন কুরআনে তোমাদের রবের উল্লেখমাত্র করো তখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, পালিয়ে যায়।
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৫-৪৬

> তাদের কেউ কেউ তোমাদের কথা শোনে, কিন্তু তাদের কুরআন অনুধাবন রোধ করতে আমরা তাদের হৃদয় আবরণে আবৃত করেছি এবং তাদের কানকে করেছি ভারাক্রান্ত। যদ্যপি সকল নিদর্শনই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাই তারা যখন তোমাদের কাছে আসে, বিতর্কে লিপ্ত হয় আর এই অবিশ্বাসীরা বলে, 'এসব আর কিছু নয় প্রাচীন জাতিগুলোর পুরান কথামাত্র।
>
> —সূরা আল-আনআম ঃ ২৫

> যে ব্যক্তিকে তার রবের নিদর্শনসমূহ স্মরণ করিয়ে দেবার পর সে, তার পূর্ববর্তী সকল কার্যকলাপ বিস্মৃত হয়ে সেই নিদর্শনসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চাইতে বড় অন্যায় কে করতে পারে ? এটা বোঝার শক্তি থেকে বঞ্চিত করে আমরা তাদের হৃদয় আবরণে ঢেকে দিয়েছি, তাদের কান ভারাক্রান্ত করেছি। আপনি তাদের পথনির্দেশ করতে চাইলেও তারা সে পথনির্দেশ গ্রহণ করবে না।
>
> —সূরা আল- কাহ্ফ ঃ ৫৭

এই আয়াত গুচ্ছের বর্ণনানুসারে, তারা যে কুরআনকে বুঝতে পারে না এ-রহস্যটির উদ্ভব এখানে যে আল্লাহ তাদের অস্বীকৃতির কারণে তাদের বোধশক্তির সম্মুখে একটি বাধা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করেছেন। এটি আল্লাহর মহিমার অভিব্যক্তিধন্য একটি বড় রহস্য ; এতে আরো প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রতিটি মানুষের হৃদয় ও মননের মালিক আল্লাহ।

যারা খোদা-ভীরু তাদেরই বোধশক্তিতে অভিষিক্ত করেন আল্লাহ্

কুরআনে উন্মোচিত আরেকটি গোপন রহস্য হচ্ছে এই যে যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাদেরকে ন্যায়-অন্যায় বিচার করার ও দু'য়ের পার্থক্য অনুধাবনের ক্ষমতা দান করেন। এই ক্ষমতাকেই বলে "প্রজ্ঞা"। সূরা আল-আনফালে এই রহস্যটির বয়ান এ রকম ঃ

> তোমরা যারা বিশ্বাস করো! তোমাদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ-ভীতি থাকে, তিনি তোমাদের একটি তুলাদণ্ড দেবেন (যা দিয়ে তোমরা ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনা করতে পারবে), তোমাদের খারাপ কাজগুলো তোমাদের থেকে স্খালন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। সত্যই আল্লাহর অনুগ্রহ অপরিসীম।
>
> —সূরা আল-আনফাল ঃ ২৯

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে ঃ আল্লাহ অবিশ্বাসীদের প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি আচ্ছন্ন করে দেন। এসব লোক যত ধীমানই হোক না কেন, তারা ধর্ম সংক্রান্ত অতি মোটা দাগের বিষয়গুলোও বুঝতে পারে না। প্রজ্ঞা হচ্ছে ঈমানদারদের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বেশির ভাগ লোকই মনে করেন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা প্রায় সমার্থক শব্দযুগল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দু'য়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বুদ্ধি হচ্ছে একটি মানসিক পারঙ্গমতা যা সকলেরই আছে।

যেমন একজন পরমাণু বিজ্ঞানী বা অঙ্কের যাদুকর হওয়াতে বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে প্রজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে ভয় ও বিবেকের প্রতি আনুগত্য থেকে উৎসারিত ফল। বুদ্ধির সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। কোন ব্যক্তি অতিশয় বুদ্ধিমান হতে পারে, কিন্তু যুগপৎ খোদাভীরু না হলে সে থেকে যাবে প্রজ্ঞাহীন।

অতএব প্রজ্ঞা হচ্ছে একটি নিয়ামত যা আল্লাহ্ ঈমানদারদের ওপর বর্ষণ করেন। যারা এই প্রজ্ঞা বা বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত তারা এমন কি তাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত নয়। যেমন ধরুন যারা নিজেদের শক্তি ও সম্পদকে ক্ষমতার উৎস ভাবে তারা উদ্ধত, দুর্বিনীত হয়। তা শুধুই তাদের প্রজ্ঞার অভাব সূচিত করে। কারণ প্রজ্ঞা থাকলে তাদের এই উপলব্ধি হতো যে আল্লাহর ইচ্ছার তুল্য কোন শক্তি নাই, এবং এই উপলব্ধি থেকেই তাদের আচরণ বিনয়নম্র হতো। কিন্তু তারা ভাবতে পারে না যে আল্লাহ্ ইচ্ছামাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সকল সম্পদ অকিঞ্চিৎকর করে দিতে পারেন, কিংবা তারা অচিরেই পার্থিব সব আহরণ পেছনে ফেলে মৃত্যুবরণ করে জবাবদিহিতার জন্য অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। পার্থিব সকল সম্পদের চাইতে অধিক নিশ্চিত ও বাস্তব হচ্ছে এই সকল সম্ভাবনা। কেবল আল্লাহ-ভীরু ঈমানদারদেরই আছে এমত প্রজ্ঞা যার ফলে তারা এই দুনিয়ার মায়াপ্রপঞ্চে বিভ্রান্ত হয়ে বিপথগামী হন না। তাঁরা বস্তুনিচয়ের সারসত্তা অবহিত হয়ে জীবনযাপন করেন। আল্লাহ বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপ্রদান করেন। তারা যত বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন ততই তাঁদের প্রজ্ঞা গভীরতর হয় এবং তাঁরা আরো অধিক পরিমাণে আল্লাহর সৃষ্টির রহস্যসমূহ পরিজ্ঞাত হন।

আল্লাহ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার দেন

কুরআনে আল্লাহর উন্মোচিত আরেকটি রহস্য হচ্ছে এই যে, যারা নেক কাজ করবে তারা ইহকাল-পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই উত্তমভাবে পুরস্কৃত হবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

> আমার তরফ থেকে আপনি বলুন ঃ হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। যারা এই জীবনে নেক কাজ করে তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আল্লাহর ভুবন বিশাল। ধৈর্যশীলরা তাদের পুরস্কার পাবে —বেশুমার।
>
> —সূরা আয-যুমার ঃ ১০

সে যাই হোক, এখন দেখা যাক, "নেক কাজ" বলতে ঠিক কি কি বোঝায়। প্রত্যেক সমাজেরই পুণ্য বা সুশীলতা বা নেক কাজ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা রয়েছে ঃ খোশমেজাজী হওয়া, দানশীল হয়ে দরিদ্রদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করা, যেকোন পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল আচরণ করা ইত্যাদি সমাজে সদাচার বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃত নেক কাজ কি আল্লাহ কুরআনে তা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

> পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই। সত্যিকার পুণ্যবান তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, আখিরাতের ওপর, সকল ফেরেশতার ওপর, সকল কেতাবের ওপর, নবীদের ওপর, যারা নিজেরা বিত্তপ্রিয় হয়েও অর্থদান করে আত্মীয়-স্বজনদের, এতিমদের ও অতি দরিদ্র দুঃস্থ ব্যক্তিদের, মুসাফির ও ভিক্ষুকদের এবং দাসমুক্তির জন্য, যারা সালাত কায়েম করে ও নিয়মিত যাকাত দেয়, যারা চুক্তি পালন করে এবং রোগে-শোকে-দুঃখে ও যুদ্ধবিগ্রহকালে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ, এরাই ভয় করে আল্লাহকে।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৭

এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে সত্যিকার নেক কাজ হচ্ছে আল্লাহ্কে ভয় করা, চূড়ান্ত হিসাবের দিনের কথা স্মরণে রাখা। বিবেকের নির্দেশ গ্রাহ্য করা ও আল্লাহর পছন্দের কাজে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজেও ঈমানদারদের উপদেশ দিচ্ছেন আল্লাহকে ভয় করতে ও পুণ্য কাজে ব্যাপৃত হতে ঃ

যেখানেই থাকো আল্লাহ্কে ভয় করো। একটি পাপকর্ম করার পর তৎক্ষণাতই একটি পুণ্য কাজ করবে পাপ কাজটি মুছে ফেলার জন্য। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিষ্টাচারী হবে।[৫]

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন তিনি তাদের ভালোবাসেন যারা নিত্যদিন পুণ্যকাজে ব্রতী হয় এবং আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা পোষণ করে। তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার ঃ

> তাইতো আল্লাহ তাদের দিয়েছেন পার্থিব পুরস্কার এবং পরকালের সর্বোত্তম পুরস্কারও। আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের যারা নেক-কাজ করে।
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৮

> .... যারা এ দুনিয়ায় নেককাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আখিরাতের আবাস আরো মনোরম। আল্লাহ-ভীরুদের আবাসস্থল কি অপূর্ব!
>
> —সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৩০

যারা পুণ্যপথের পথিক, যারা আত্মত্যাগী, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে সদা-যত্নবান তাদের জন্য কুরআনের এই সুসংবাদ।

আল্লাহ তাঁদের ইহকাল ও পরকালে সুন্দর জীবনের সুসংবাদ দেন এবং তাঁদের প্রতি বৈষয়িক ও আত্মিক উভয় প্রকার নিয়ামত বাড়িয়ে দেন। কুরআনে এর দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে নবী সুলায়মান (আঃ) ও নবী ইউসুফ (আঃ)-এর কথা। সুলাইমান (আঃ)-কে একটি গোটা রাজ্যদান করা হয়, যার

তুল্য দান আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি কোনদিন এবং ইউসুফ (আঃ) কে করা হয় মিশরের অপরিমেয় ধনরত্ন ভাণ্ডারের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি আল্লাহর দান সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> "তিনি কি আপনাকে দারিদ্র্য জর্জরিত অবস্থায় পেয়ে অতঃপর ধনাঢ্য করে দেননি ?"
>
> —সূরা আদ-দোহা ঃ ৮

স্মরণে রাখতে হবে যে, সুন্দর ও গৌরবময় জীবন শুধু আগের দিনের মানুষের জন্যই আল্লাহর বড় দান নয়, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি প্রতি যুগেই তাঁর ঈমানদার বান্দাদের উত্তম জীবন দানে পুরস্কৃত করবেন ঃ

> পুরুষ-নারী নির্বিশেষে ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের আমরা দান করব উত্তম জীবন এবং তাদের শ্রেষ্ঠ কাজের যোগ্য পুরস্কার।
>
> —সূরা আন-নাহল ঃ ৯৭

মুমিনেরা পার্থিব পরমার্থের পেছনে ছোটেন না, তাঁরা বিত্তবৈভব, মর্যাদা বা ক্ষমতার জন্যে লালসা প্রদর্শন করেন না।

একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তাঁরা তাঁদের সম্পদ ও জীবন বিক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের খোদাপরস্ত জীবনাচার, সালাত আদায় ও ধর্মের সেবা বিঘ্নিত করতে পারে না। অধিকন্তু ক্ষুধা দারিদ্র্যের পীড়নে পরীক্ষা কালেও তাঁরা একাগ্র, ধৈর্যশীল ও অনুগত থাকেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কালে হিজরতকারী মুমিনগণ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা তাঁদের ঘরবাড়ি, ভূসম্পত্তি, বাগবাগিচা, পেশা ও ব্যবসায় পেছনে ফেলে অন্য শহরে হিজরত করেন এবং অতি অল্পে তুষ্ট থেকে জীবনযাপন করেন, বিনিময়ে তাঁদের একান্ত প্রার্থনা ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। তাঁদের অল্পে-তৃপ্তি ও পরকাল ভাবনা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান করে এবং সুন্দর জীবনের উপহার অর্জন করে। এই অর্জন তথা নবলব্ধ সম্পদ তাঁদেরকে এই দুনিয়ার জীবনে মোহাবিষ্ট করেনি, বরং আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়ে ও প্রার্থনায় প্রণোদিত করেছে। উচ্চ নৈতিক আদর্শনিষ্ঠার বিনিময়ে এই দুনিয়ায় সুন্দর জীবন প্রত্যেক মুমিনের প্রতি আল্লাহর প্রতিজ্ঞা।

আল্লাহর প্রতিজ্ঞা ঃ বান্দার নেক কাজ বহুগুণিত হবে

আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর বান্দার ভালো কাজের সুফল বহুগুণিত হবে। এই বিষয়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত ঃ

> যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে সে তার দশ গুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে সে তার মন্দ কাজের সমানুপাত সাজাপ্রাপ্ত হবে, আর তার ওপর জুলুম করা হবে না।
>
> —সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬০

> আল্লাহ্ কারও প্রতি ধূলি পরিমাণ জুলুম করেন না এবং কোন ভালো কাজ করা হলে আল্লাহ্ তার সুফল বহুগুণিত করেন, সরাসরি বিপুল পুরস্কার প্রদান করেন।
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ৪০

আল্লাহ্ যে নেক কাজের সুফল বহুগুণে প্রতিদান করেন তার স্পষ্টতম নিদর্শন হচ্ছে এই দুনিয়া ও আখেরাতের আয়ুষ্কালের ব্যবধান। এই দুনিয়ায় মানুষের আয়ুষ্কাল খুবই সংক্ষিপ্ত, বছর ষাটেক, গড়ে। এই সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নেক কাজ করে পরকালে তারা অনন্ত কল্যাণ দ্বারা পুরস্কৃত হয়। এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ দিয়েছেন একটি আয়াতে ঃ

> যারা নেক কাজ করবে তাদের জন্যে রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান এবং ততোধিক ....
>
> —সূরা ইউনুস ঃ ২৬

"অনন্ত"-কালের ধারণাটি উপলব্ধি করতে না পারলে এই পুরস্কারের মহত্ত্ব অনুধাবন করা যাবে না। মনে করুন পৃথিবীতে এ যাবৎকাল পর্যন্ত যত লোক জন্মেছে এবং ভবিষ্যতে যত লোক জন্মগ্রহণ করবে তারা প্রত্যেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত গণনা করতে করতে জীবন অতিবাহিত করলো এবং সব গণনা যোগ করা হলো। রাশিটি এমন কল্পনাতীত বিশাল হবে যে তা একেবারেই দুরুচ্চার্য। তবু "অনন্তের" পাশে এই বিশাল রাশিটি হবে শূন্যের মতোই অর্থহীন। কারণ "অনন্ত' মানে অনিঃশেষ, সীমাহীন সময়। যারা এ জীবনে আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদন করেন পরকালে তাঁদের আবাসস্থল হবে জান্নাত। সেখানে তাঁরা বাস করবেন অনন্তকাল, তাঁদের আত্মার যেকোন বাসনা পূর্ণ হবে এবং তাতে কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। এই দৃষ্টান্তটি আল্লাহর করুণা ও নিয়ামতের অকল্পনীয় বিশালত্ব অনুধাবনে সহায়ক হবে।

বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে আলোর দীপ্তি

কিন্তু অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে কালিমার অন্ধকার

আল্লাহ কুরআনে যেসব রহস্য উন্মোচন করেছেন তার একটি হচ্ছে এই যে, মানুষের মুখে ও ত্বকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। বহু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডলে আলোর দীপ্তি প্রতিভাত হয়, কিন্তু অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল থাকে কালিমার আঁধারে ম্লান ঃ

> এবং তোমরা দেখতে পাবে তাদের সেখানে (জাহান্নামে) আনয়ন করা হয়েছে অপমানে হীন অবস্থায়, চোরা চাহনিতে ইতিউতি তাকাচ্ছে তারা ....
>
> —সূরা আশ-শুরা ঃ ৪৫

> যারা ভালো কাজ করেন তারা সর্বোত্তম ও তার চেয়ে অধিক প্রতিদান পাবেন! ধূলি বা পংকিলতায় ঢাকা পড়বে না তাঁদের মুখমণ্ডল। তাঁরা হচ্ছেন জান্নাতী উদ্যানের সহচর, সেখানেই তাঁরা থাকবেন অনন্তকাল, চিরকাল। কিন্তু যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের ক্ষেত্রে— একটি মন্দ কাজ অনুরূপ একটি মন্দ কাজ দ্বারা পরিশোধিত হবে ; ক্রমাগত পতিত হবে তারা, কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহর হাত থেকে। যেন কৃষ্ণতম রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাদের মুখমণ্ডল। তারা হচ্ছে নারকীয় অগ্নিকুণ্ডের সহচর। সেখানেই তারা থাকবে অনন্তকাল, চিরকাল।
>
> —সূরা ইউনুস ঃ ২৬-২৭

উপরোক্ত আয়াতসমূহের বর্ণনামতে, হতমানে ম্লান হয়ে থাকে অবিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীদের মুখমণ্ডল থাকে আলোর

দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। আল্লাহ বলেন, তাঁদের চেনা যায় তাঁদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন দ্বারা ঃ

> মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর দূত, আর যাঁরা তাঁর সাথে আছেন তাঁরা অবিশ্বাসীদের প্রতি ভয়ঙ্কর কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুকম্পাশীল। তোমরা দেখতে পাবে তাঁরা প্রণত হচ্ছেন ও সিজদা করছেন আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাঁদের চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে, সিজদার চিহ্ন...
>
> —সূরা আল-ফাত্‌হ্‌ ঃ ২৯

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করছেন যে অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতকারীদের চেনা যায় তাদের মুখ দেখে ঃ

> দুষ্কৃতকারীদের চেনা যাবে তাদের চিহ্ন দেখে, এবং তাদের মাথার চুল আর পা ধরে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে।
>
> —সূরা আর-রহমান ঃ ৪১

> আমরা চাইলে আপনাকে তাদের পরিচয় বলে দিতে পারতাম এবং আপনিও তাদের সনাক্ত করতে পারতেন তাদের চিহ্ন ও তাদের স্ববিরোধী কথাবার্তার কারণে। আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত আছেন।
>
> —সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩০

কুরআনে এই গুরুত্বপূর্ণ রহস্যটি উন্মোচিত হয়েছে যে ব্যক্তির বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের ফলে তার মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। আত্মিক উপলব্ধি দৈহিক পরিবর্তন সাধন করে ; মুখমণ্ডলের কাঠামোটি অবিকল থাকলেও তার অভিব্যক্তির রূপভেদ ঘটে অর্থাৎ তা আলোকিত বা তমসাচ্ছন্ন হয়। ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় তা দেখে সনাক্ত করতে পারে।

আল্লাহ মন্দ কাজ নিশ্চিহ্ন করেন

মুমিনদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, করুণা ও জান্নাত লাভ করা। কিন্তু মানুষ সৃষ্ট হয় দুর্বল ও বিস্মরণশীলরূপে, তাই পদে পদে সে ভুল করে, ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সবার চাইতে ভালো করে জানেন, এবং তিনি পরম করুণাময় ও দরদী। তিনি আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে তিনি তাঁর অকৃত্রিম বান্দাদের মন্দ কাজের চিহ্ন মুছে দেবেন এবং তাঁদের হিসাব-নিকাশ সহজ করে দেবেন ঃ

> যার ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে সহজেই হয়ে যাবে তার হিসাব-নিকাশ আর সে প্রফুল্ল চিত্তেই ফিরে আসবে তার পরিবারের কাছে।
>
> —সূরা আল-ইনশিকাক ঃ ৭-৯)

কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ প্রত্যেক লোকেরই মন্দ কাজকে ভালো কাজে রূপান্তরিত করেন না। আল্লাহ যাদের মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ক্ষমা করেন তাদের বিশিষ্ট গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন কুরআনে।

যারা মারাত্মক মন্দ কাজ পরিহার করে

একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা যদি নিষিদ্ধ মারাত্মক বা বড় ধরনের মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকো তাহলে আমি তোমাদের লঘু অন্যায় কাজগুলো মাফ করে দেব এবং তোমরা সম্মানের তোরণ দিয়ে প্রবেশ লাভ করবে —সূরা আন-নিসা ঃ ৩১। মুমিনেরা এ বিষয়ে অবহিত ; তারা আল্লাহ্র নির্দেশিত সীমা লংঘন থেকে বিরত থাকেন এবং নিষিদ্ধ অন্যায় কাজ পরিহার করেন। যদি তাঁরা কখনো বিস্মরণ কিংবা অনবধানতাজনিত কারণে ভুল করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা আল্লাহ্র কাছে ফিরে আসেন এবং অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কাদের অনুশোচনা গ্রহণ করবেন সে বিষয়েও বলেছেন কুরআনে। সুতরাং আল্লাহর আদেশ নির্দেশাবলী জেনেও

ইচ্ছাকৃতভাবে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়ে "যা-ই করি না কেন আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন" বলা যুক্তি নয় যুক্তির অপলাপমাত্র। কারণ আল্লাহ্ তার সেসব বান্দার পাপাচার স্খালন করেন যারা অজ্ঞতাবশতঃই পাপাচার করেছে এবং ক্ষণমাত্র কালক্ষেপণ না করে অনুশোচনা (তওবা) করেছে, সেই পাপাচার থেকে বিরত হয়েছে এবং কৃত পাপকর্মের সংশোধন করেছে ঃ

> আল্লাহ্ কেবল তাদের তওবাই কবুল করেন যারা অজ্ঞতাবশত অন্যায় কাজ করে ফেলে কিন্তু করার পর তৎক্ষণাতই তওবা করে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সদয় হন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।
>
> আর তাদের জন্য তওবা নয় যারা আমৃত্যু অন্যায় কাজ করতেই থাকে আর আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে বলে, "এই আমি তওবা করলাম" এবং তাদের জন্যও তওবা নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়। তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ১৭-১৮

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মন্দ কাজের জন্য ক্ষমা পেতে হলে এবং বিচারের দিন কোনরূপ পরিতাপ থেকে রক্ষা পেতে হলে পাপাচার পরিহার অবশ্য কর্তব্য। কোন মুমিন কোন মন্দ কাজ করে ফেললে কালবিলম্ব না করে তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

সৎকাজে নিয়োজিত হন যারা

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ যারা নেক কাজ করবে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

> যেদিন তিনি তোমাদের জড়ো করবেন জমায়েতের দিনে, সেদিন হবে লাভ-লোকসান হিসাব-নিকাশের দিন। যে ব্যক্তি ঈমান রাখবে এবং নেক আমল করবে আল্লাহ্ তার মন্দ কাজ মাফ করে দেবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতের উদ্যানে যার নিচে দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে সে থাকবে চিরকাল, অনন্তকাল। এটাই হচ্ছে মহাবিজয়।
>
> —সূরা আত-তাগাবুন ঃ ৯

> তবে তাদের ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে ; আল্লাহ্ তাদের মন্দ কাজগুলোকে উত্তম কাজে রূপান্তরিত করে দেবেন—আল্লাহ্ সতত-ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।
>
> —সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭০

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রতিটি কর্ম ও আচরণই হচ্ছে, "সৎ কাজ" বা "নেক আমল"। যথা ঃ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের বাণী প্রচার করা, আল্লাহতে ঈমান নেই এমন লোকদের আল্লাহর নির্দেশিত অমোঘ ভাগ্যলিপি বিষয়ে অবহিত করা, গুজব রটনা থেকে কাউকে বিরত করা, আবাসস্থল ও শরীর পরিচ্ছন্ন রাখা, অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মনের দিগন্ত প্রসারিত করা, প্রসন্ন বাক্যালাপ করা। পরকাল বিষয়ে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, রুগ্নদের সেবা করা, প্রবীণদের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা, মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে সদুপায়ে অর্থোপার্জন করা, শুভশক্তি দ্বারা অশুভকে প্রতিহত করা ও ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য— এ ধরনের কর্মকেই বলা যায় নেক কাজ। যারা চাইবে যে তাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করা হবে এবং পরকালে ভালো কাজে রূপান্তরিত হবে তাদের অবশ্যই এমনভাবে জীবনযাপন ও কর্মসাধন করা উচিত যাতে আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধান সম্ভব হয়।

এতদুদ্দেশ্যে তাদের অবশ্যই হামেশা বিচারদিনের হিসাব-নিকাশের কথা স্মরণ রাখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তিকে যদি জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য করে তাকে দেখানো হয় তার জীবনে কৃত মন্দ কাজগুলো এবং সতর্ক করা হয় যে এগুলোর জন্যে ক্ষমা পেতে হলে তাকে সঠিক পন্থায় কর্মোদ্যোগী হয়ে নেক কাজ করতে হবে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বা কার্যধারা কি হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

যে ব্যক্তি নিজের চোখে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড দর্শন করবে, জাহান্নামে নিপতিতদের হতাশা, যন্ত্রণা ও গোঙানি দেখবে, জাহান্নামের যন্ত্রণাময় দণ্ডসমূহ কার্যকর করার দৃশ্য অবলোকন করবে সে তখনি আল্লাহর সর্বোত্তম সন্তুষ্টি

বিধানের উপযোগী পন্থায় কার্যনির্বাহের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। সে যথার্থ সময়ে সালাত আদায় করবে, সৎকর্মে উদ্যোগী হবে, অনবধানতা পরিহার করবে এবং যে কাজে আল্লাহর অধিকতর সন্তুষ্টি বিধান হবে বলে সে জানে সেটি ছেড়ে আল্লাহর কম সন্তুষ্টি বিধান হবে এমন কাজে উদ্যত হতে সাহস করবে না। কারণ জাহান্নাম, যা' তার পাশেই রয়েছে, সর্বদা তাকে মনে করিয়ে দেবে তার অনন্ত জীবন ও আল্লাহর শাস্তির কথা। এমন ব্যক্তি কষ্মিনকালেও তার করণীয় কাজ ফেলে রাখবে না কিংবা কাজে আলস্য বা শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেবে না বরং তার বিবেকের নির্দেশমত অবিলম্বে ও নিখুঁতভাবে কার্যনির্বাহ করবে। সালাতে নিয়মিত ও নিষ্ঠাবান হবে। এই দুনিয়ার জীবনের মন্দ কাজ অনন্তজীবনে ভালো কাজে রূপান্তরিত হবে শুধু তাদের ক্ষেত্রেই যারা নেক আমল করে এবং আল্লাহ ও শেষবিচার দিনকে এমনভাবে ভয় করে যেন তারা সদ্য জাহান্নাম দর্শন করে এই জগতে ফিরে এসেছে কিংবা তারা নিজেদের দেহের পাশেই সতত প্রজ্জ্বলিত নরককুণ্ড দেখতে পাচ্ছে। এহেন মুমিন ব্যক্তিগণ পরকাল বিষয়ে নিশ্চিত এবং তারা আল্লাহর সাজাকে ভীষণ ভয় পায় ও সর্বতোভাবে তা পরিহার করতে চায়।

আল্লাহর পথে ব্যয়ের ঐশী অভিপ্রায়

জনহিতকর কাজে আল্লাহ্‌র রাহে সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে এমন একটি অতীব মহত্ত্বপূর্ণ এবাদতের কাজ যা মানুষের দেহের ও মনের তথা বিষয় ও আত্মার মালিন্য নিষ্কাশন করে এবং মানুষের আত্মাকে সুশৃঙ্খল ও পরিশুদ্ধ ক'রে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের উপযুক্ত সুউচ্চ স্তরে উন্নীত করে। আল্লাহ্ তাঁর পেয়ারা হাবীব নবী করিম (সঃ)-কে বলেছেন মুমিনদের কাছ থেকে দানগ্রহণ ক'রে তাদের পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দিতে। নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে এই নির্দেশ ঃ

> আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহণ করুন তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে .....।
>
> —সূরা আত-তাওবা ঃ ১০৩

পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার যে ব্যয় তা কুরআনে নির্দেশিত পথেই করতে হবে। ভিখিরীর হাতে সামান্য দু'-এক টাকা ধরিয়ে দিয়ে বা দরিদ্র জনকে দুটি জীর্ণ বস্ত্র দান করে কিংবা একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুণ্নিবৃত্তি করে অনেকে ভাবেন তাঁদের কর্তব্য তাঁরা কত বেশিই না করে ফেলেছেন! কোন সন্দেহ নেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই যদি এ-কাজ করা হয়ে থাকে তবে তা যত সামান্যই হোক পুরস্কৃত হবে। তবে কুরআনে কিছু সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন কুরআনে মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করতে ঃ

> .... তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, কি তারা দান করবে। আপনি বলবেন, 'তোমাদের প্রয়োজন মেটাবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা।' এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন তোমাদের জন্য, যাতে আশা করা যায় যে তোমরা চিন্তা করবে ;
>
> — সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৯

এই দুনিয়ায় মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন খুবই সামান্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদই হচ্ছে উদ্বৃত্ত সম্পদ। বিবেচ্য বিষয় দানের

পরিমাণ নয়, দাতার সাধ্যানুসারে আন্তরিকতাপূর্ণ দান। আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন এবং তিনি মানুষের বিবেকের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন কতটা সম্পদ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা সিদ্ধান্ত করার ভার। যারা জাগতিক উচ্চাকাঙ্খা বা সুখ-সম্পদের মোহে মোহাচ্ছন্ন নয় বরং পরকালের জীবন নিয়ে চিন্তিত, তাদের জন্যে দান খয়রাতই হচ্ছে এবাদতের একটি অতি সহজ ও প্রকৃষ্ট রূপ। এটি হচ্ছে আমাদের আত্মাকে লালসার আবিলতা থেকে মুক্ত করার একটি উপায়। এবাদতের এই রূপটি নিঃসন্দেহে মুমিনদের বিচার দিনের হিসাব-নিকাশের জন্য খুবই জরুরী। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে সে অনুগৃহীত হয় ঃ

> দুই শ্রেণীর লোক অনুগৃহীত হবে ঃ এক, যে ব্যক্তি কুরআন লাভ করেছে এবং কুরআন অনুসারে জীবনযাপন করেছে ; যা কিছু হালাল বলে হুকুম করা হয়েছে তা সে হালাল বলে গ্রহণ করেছে এবং যা কিছু হারাম বলে হুকুম করা হয়েছে তা সে হারাম বলে বর্জন করেছে। দুই, আরেক শ্রেণীর লোক যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন এবং সেই ব্যক্তি তার সম্পদ স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করেছে ও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে।

দান করার সময় ভালোটাই দেবেন

লোকে প্রায়শ কোন অভাবগ্রস্ত লোককে বা আর্তজনকে এমন অনুগ্রহ করে যাতে নিজের স্বার্থের কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। অভাবগ্রস্ত লোককে সাহায্য করার দায় সারা হয় এমন বস্তুসামগ্রী দিয়ে যা তার নিজের কাজে লাগছে না বা পছন্দ হয় না কিংবা হালফ্যাশনে বাতিল হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ কিন্তু বান্দাদের আদেশ করছেন অপরকে সাহায্যের জন্য নিজের প্রিয় বস্তু-সামগ্রীই দান করতে হবে। ব্যক্তিগত পছন্দের জিনিস দান করা খুব কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু আত্মশুদ্ধি ও মোক্ষলাভের জন্য কঠিন ব্রতের বিকল্প নেই। মানুষের কল্যাণে উন্মোচিত আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপন

রহস্য হচ্ছে এটি। আল্লাহ বলেছেন, মানুষ অন্য কোন উপায়ে দানের পুণ্য অর্জন করতে পারবে না ঃ

> তোমরা কখনো সত্যিকার পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। তোমরা যা কিছুই দান করো আল্লাহ তা জানেন।
>
> — সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯২

> হে মুমিনগণ! তোমরা যা অর্জন কর এবং জমিন তোমাদের জন্য যা' উৎপাদন করে তা থেকে উৎকৃষ্ট কিছু সম্পদ দান কর। চোখ বন্ধ করে না থাকলে তোমরা নিজেরা নিতে না এমন মন্দ জিনিস দান করো না। জেনে রেখো, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও পরম প্রশংসিত।
>
> — সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৭

আল্লাহর পথে ব্যয় করা তার অধিকতর নৈকট্য লাভের একটি উপায়

একজন মুমিনের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনের চাইতে বড় আর কিছু নেই। একজন মুমিন সারাজীবন সচেষ্ট থাকেন আল্লাহর নিকটতর হবার জন্যে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

> হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর পথে জিহাদ কর, তাহলে সাফল্যলাভে আশান্বিত হতে পারবে।
>
> — সূরা আল-মায়িদাহ ঃ ৩৫

মুমিনদের উদ্দেশ্যে একটি গোপন রহস্য ও সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন যা ব্যয় করা হবে তা তাঁর নৈকট্য লাভের একটি উপায় হওয়া উচিত। কাজেই একজন মুমিনের পক্ষে তাঁর প্রিয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ দান করা কিছুমাত্র কষ্টের কাজ নয় বরং আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের একটি সুবর্ণ সুযোগ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

মরুবাসী আরবদের কেউ কেউ আল্লাহ্তে ও শেষ বিচারের দিনে ঈমান এনেছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে তাদের দান তাদেরকে আল্লাহ্র অধিকতর নৈকট্যে ও রাসূল (সঃ)-এর প্রার্থনার সান্নিধ্যে নিয়ে আসবে। বাস্তবিকই তা তাঁদেরকে সেই নৈকট্যে ও সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর রহমতে দাখিল করে নেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়াময়।

— সূরা আত্-তাওবা ঃ ৯৯

আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করা হয় তার উত্তম প্রতিদান পাওয়া যায়

কারও সম্পত্তি থেকে দান সম্পর্কে কুরআনের উন্মোচিত আরেকটি রহস্য হচ্ছে এই যে, যা কিছু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হবে তা অবশ্যই প্রত্যর্পণ করা হবে। কেউ যদি দারিদ্রের ভয়ে ভীত না হয়ে আল্লাহ্র পথে দান করে তাহলে সে সারাজীবন অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ্র পথে যা কিছু ব্যয় করা হয় তা পূর্ণরূপে ফেরত পাওয়া যায়। এই প্রতিশ্রুতি সম্বলিত কয়েকটি আয়াত নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

তাদের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আপনার নয় ; আল্লাহ্ যাকে চান তাকে সৎপথে নিয়ে আসেন। তোমরা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যে দান কর তা তোমাদের নিজেদের উপকারার্থেই কর। যা কিছু তোমরা দান কর তার বিনিময়ে পুরস্কার পুরোপুরি তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। তোমাদের ওপর জুলুম করা হবে না।

— সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭২

আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তার পূর্ণ প্রতিদান তোমরা পাবে। তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

— সূরা আল-আনফাল ঃ ৬০

> বলুন! আমার রব যাকে ইচ্ছে তার জীবিকা বাড়িয়ে দেন কিংবা কমিয়ে দেন, কিন্তু তোমরা যা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে তা তিনি প্রতিদান করবেন। তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ জীবিকা-দাতা'।
>
> — সূরা সাবা ঃ ৩৯

মুমিনগণ শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের আশায় তাঁদের ধন-সম্পদ দান করেন ; কিন্তু আল্লাহ একটি রহস্য উন্মোচন করে জানিয়েছেন তাঁরা যা কিছু ব্যয় করেন তা তাঁদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। উপরের আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, যা কিছু দান করা হয় আল্লাহ তার প্রতিদান দেন। প্রতিদান হয় দুই ভাবে ঃ এই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অনন্তজীবনে মুমিনদের জন্য আল্লাহ্‌র তৈরি জান্নাতের অশেষ উপহার। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর পথে দান করে তাদের বিপরীতে, যারা তাদের সম্পদ দানে কৃপণতা করে কিংবা যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করে অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ের বাসনা পোষণ করে আল্লাহ তাদের জীবিকা হ্রাস করেন। যারা কুসিদবৃত্তি করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের একটিতে বলা হয়েছে ঃ

> আল্লাহ কুসীদ অবলুপ্ত করেন এবং সাদকা বর্ধিত করেন। নিয়ত অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।
>
> — সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭৬

মুমিনেরা তাদের সম্পদ দানের বিনিময়ে যে প্রাচুর্য অর্জন করেন সে বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

> যারা তাদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের রূপক হচ্ছে একটি শস্য-বীজ। একটি শস্য-বীজ সাতটি শীষ উৎপাদন করে এবং প্রতিটি শীষে একশত শস্য-দানা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে তার দানের বহুগুণিত প্রতিদান করেন। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
>
> — সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬১

> হে ঈমানদার মুমিনগণ! তোমরা কৃতজ্ঞতা দাবি করে বা কটু কথা বলে তোমাদের দানকে নস্যাৎ করো না ঐ ব্যক্তির মত যার আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস নেই কিন্তু দানখয়রাত করে লোক দেখানোর জন্য। ঐ ব্যক্তির প্রতীক হচ্ছে কাদামাটির আস্তরণে

আবৃত একটি মসৃণ প্রস্তরখন্ড, প্রবল বর্ষণে বিধৌত হবার পর যার আস্তরণ ধুয়ে-মুছে গিয়ে নগ্ন হয়ে পড়ে থাকলো। তাদের অর্জনের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের পথপ্রদর্শন করেন না।

— সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৪

যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ও নিজেদের চিত্তের দৃঢ়তা বিধানের মানসে সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত একটি বাগান। প্রবল বৃষ্টিপাতে বাগানে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে সেখানে থাকে শিশির কণা। তোমাদের সকল কাজই আল্লাহ্ দেখেন।

— সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৫

উপরের আয়াতসমূহের প্রতিটি হচ্ছে একেকটি গোপন রহস্য যা মুমিনদের জন্যে কুরআনে উন্মোচিত করেছেন আল্লাহ্। মুমিনগণ শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও করুণা এবং জান্নাত লাভের জন্য তাঁদের সম্পদ ব্যয় করেন। কুরআনে উন্মোচিত রহস্যগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁরা আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত কামনা করেন। তাঁরা যত বেশি পরিমাণে আল্লাহ্র পথে তাঁদের ধন-সম্পদ ব্যয় করেন এবং যত বেশি সতর্কতার সঙ্গে হারাম ও হালালের বিধিবিধান পালন করেন তত বেশি পরিমাণে আল্লাহ্ তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন, তাঁদের কর্তব্যপালন সহজ করে দেন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের জন্য তত বেশি সুযোগ ও সামর্থের যোগান দেন। আল্লাহ্কে ভয় করেন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে কোন ভীতি পোষণ করেন না এমন একজন ঈমানদার ব্যক্তি সারাজীবনব্যাপী এই রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

উত্তম কাজ ও সুন্দর ভাষা ব্যবহারের ফল

মানুষ অবিরত এমন একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ খুঁজছে যেখানে সে নিরাপদে বাস করতে পারে এবং বন্ধুত্বের পরিমন্ডলে আনন্দ-উজ্জ্বল জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই আকুতি সত্ত্বেও মানুষ এই মূল্যবোধগুলো অর্জনে সচেষ্ট হয় না, বরং সে নিজেই সংঘাত ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়শ মানুষ চায় যে অন্যেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সংস্থান করবে ও বন্ধুভাবাপন্ন হবে। এটা দেখা যায় পারিবারিক সম্পর্কে, কোম্পানির কর্মী-শ্রমিকদের সম্পর্কে, সামাজিক শান্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কিন্তু বন্ধুত্ব, স্বস্তি ও শান্তি বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন মানবহিতৈষণা। শেষ কথাটি বলার অর্থ, শুধু নিজের সুখ-শান্তি বিবেচনা এবং আপোষ-রফা বা ত্যাগ স্বীকারে অনীহা পরিহার না করলে সংঘাত ও অশান্তি অবধারিত। কিন্তু আল্লাহ-ভীরু মুমিনদের আচরণ হয় ভিন্ন রকম। তাঁরা হন নিঃস্বার্থ, ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। এমনকি তাঁদের প্রতি অবিচার করা হলেও সমাজের নিরাপত্তা ও অপরের সুখ-শান্তিকে নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে নিজের ন্যায্য অধিকার বিসর্জন দিতেও পরাঙ্মুখ হন না। তাঁদের আচরণে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ব্যত্যয় ঘটে না। এই মহৎ গুণাবলী অর্জনের জন্য মুমিনদের তাগিদ দিয়েছেন আল্লাহ্ঃ

> একটি ভালো কাজ আর একটি খারাপ কাজ একইরূপ নয়। খারাপ কাজ পরিহার করে তদস্থলে একটি ভালো কাজ করো কারও সঙ্গে যদি তোমার শত্রুতা থাকে তাহলে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। একমাত্র যারা একাগ্র বা দৃঢ়চেতা তারা ছাড়া কেউ এটা অর্জন করতে পারবে না। একমাত্র যাদের বড় সৌভাগ্য আছে তারা ছাড়া কেউ এটা অর্জন করতে পারবে না।
>
> — সূরা ফুসিলাত ঃ ৩৪-৩৫

> আপনি আপনার রবের পথে আসার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানান জ্ঞান ও সদুপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সহৃদয়তার সঙ্গে। আপনার রব ভালোভাবেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর কে আছে সঠিকপথে তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।
>
> — সূরা আল-নাহ্‌ল ঃ ১২৫

উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মুমিনদের ভালো কাজের বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তাদের শত্রুকে "অন্তরঙ্গ বন্ধু"-তে রূপান্তরিত করেন। এটি আল্লাহ্‌র গোপন রহস্যগুলোর অন্যতম। আসল কথা হচ্ছে, সকল হৃদয়ই আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাকে চান তার হৃদয় ও চিন্তাধারা পরিবর্তন করে দেন।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্‌ সুন্দর শব্দ চয়ন ও নম্র ভাষা ব্যবহারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আল্লাহ্‌ নবী মুসা (আঃ) ও নবী হারুন (আঃ)-কে ফেরাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নম্রভাষায় আলাপ-আলোচনা করতে আদেশ করেন। ফেরাউনের জুলুম, ঔদ্ধত্য ও নির্মমতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তাঁর নবীদের আদেশ করেন তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলতে। তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ্‌ এভাবে ঃ

> আপনারা ফেরাউনের কাছে যান, সে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলুন, হয়তো সে শুনবে কিংবা কিছুটা ভয় পাবে।
>
> — সূরা ত্বাহা ঃ ৪০-৪৪

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌ মুমিনদের নির্দেশ দিচ্ছেন তাঁরা তাঁদের শত্রুদের, অবিশ্বাসীদের ও উদ্ধত-প্রকৃতির ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপে-আচরণে কি ধরনের মনোভাব গ্রহণ করবেন। এই নির্দেশাবলী নিশ্চিতই ধৈর্য, তিতিক্ষা, ইচ্ছাশক্তি, বিনয় ও বিচক্ষণতাকে উৎসাহিত করে। একটি গোপন রহস্য উন্মোচনের সূত্রে আল্লাহ মুমিনদের অবহিত করেছেন যে তাঁর নির্দেশাবলী ও উচ্চ নৈতিক আদর্শের অনুসারী মুমিনদের কাজ তিনি ফলপ্রসূ করবেন এবং তাঁদের শত্রুদের মিত্রে রূপান্তরিত করবেন।

আল্লাহ্ মানুষের জন্য স্থান করে দেন

মানুষ মারাত্মক ভুল করে যখন সবকিছুকেই অন্য কিছুর ফল ভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইতিপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সে ভয় করে আল্লাহর পথে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করলে তার টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্র সৃষ্টির একটি গোপন রহস্যের কথা সে জানে না ; যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দান করে আল্লাহ্ এই দুনিয়ায় ও পরকালে তাদের ধন-সম্পদ বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষ এটা একটা কার্যকারণ প্রক্রিয়ারূপেই অনুভব করে। আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্ তার বিষয়-আশয়ের ব্যাপারগুলো সহজ করে দেন যার ফলে তার আয় বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তি অপর কোন কুপিত ব্যক্তিকে ভদ্রভাবে সামাল দিতে না পেরে অগত্যা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করে, তার জন্যে কুরআনে উন্মোচিত রহস্যাবলীই প্রকৃত সমাধান।

কুরআনে উন্মোচিত এসব রহস্যের একটি হচ্ছে আল্লাহ্র অন্যতর একটি আদেশ ঃ

> হে মুমিনগণ! তোমাদের যখন বলা হয় ঃ 'মজলিসের মধ্যে স্থান করে দাও', তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন! আর যখন বলা হয় 'উঠে যাও!' তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা আরো উন্নীত করে দেবেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ জানেন।
>
> — সূরা আল-মুজাদালা ঃ ১১

আল্লাহ বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কোন সমাবেশে নবাগতদের জন্য স্থান করে দেবার বা লোকের ভীড় পাতলা করার আহ্বানে সাড়া দিতে। এটি একাধারে সুবিবেচনা ও সদয়তা এবং আনুগত্যের পরিচায়ক। আল্লাহ্ মুমিনদের বলছেন ঃ এই আনুগত্যের বিনিময়ে তিনি তাদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান করে দেবেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। প্রতিটি মানুষের আত্মা ও অভিপ্রায় আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি তার আচরণে সন্তুষ্ট হলে তাকে যেকোন উপহার ও নিয়ামত দান করতে পারেন। এই কারণে মুমিনগণ সবকিছুর ফল ও পুরস্কার প্রত্যাশা করেন আল্লাহ্‌র কাছে। কোন সমাবেশে অগান্তুকদের জন্যে স্থান করে দিয়ে তাঁরা উপকৃতদের কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করেন না, তাঁরা প্রত্যাশা করেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং চিত্তের প্রশান্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিরূপে আল্লাহ্‌র উপহার।

আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন যারা আল্লাহর ধর্মকে সাহায্য করে

আল্লাহ্ কুরআনে মুমিনদের কাছে একটি রহস্য উন্মোচন করেছেন এভাবে ঃ

> হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্কে সাহায্য করো তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন।
>
> — সূরা মুহাম্মদ ঃ ৭

মুমিনদের জীবনব্যাপী সাধনা হচ্ছে মানবসমাজের কাছে কুরআনের মূল্যবোধগুলো তুলে ধরা ও আল্লাহর বাণী প্রচার করা। পক্ষান্তরে, ইতিহাসের সর্বযুগেই দেখা গেছে কিছু অবিশ্বাসী লোক দল বেঁধে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং কোথাও চাপ প্রয়োগে, কোথাও শক্তিপ্রয়োগে তাঁদের সাধনপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তিনি সর্বদা অবিশ্বাসীদের প্রতিপক্ষে মুমিনদের সঙ্গে আছেন, তিনি তাঁদের বিষয়-আশয় জটিলতামুক্ত করবেন এবং তিনি মুমিনদের সাহায্য ও সহায়তা করবেন। মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র পথে অকৃত্রিম প্রয়াসে নিরত হন তাঁরা জীবনের প্রতি মুহূর্তেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আল্লাহ্ তাদের সকল কাজ সহজ সমাপ্তিতে পূর্ণ করেন, সকল প্রচেষ্টা সফল করেন, কঠিনতম সমস্যার সহজ সমাধান করে দেন। এমনকি দুর্বল বিশ্বাসের লোকেরা যখন হতাশ ও দিশেহারা হয়ে হায় হায় করে, কপালে করাঘাত করে লুটিয়ে পড়েছে তখন আল্লাহ্ তাদের সাহায্য প্রেরণ করেছেন ও তাদের কামিয়াব করেছেন।

মুমিনেরা যারা আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ তাঁরা কখনো নিরাশ হন না, বরং উদ্দীপনার সঙ্গে অপেক্ষা করেন আল্লাহ কিভাবে ঘটনার সমাপ্তি টানেন তা দেখার জন্যে। নবী মুসা (আঃ) ও তাঁর

জনগোষ্ঠী এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নবী মুসা (আঃ) ইসরায়েলের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন ফেরাউনের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে। কিন্তু ফেরাউন ও তার বাহিনী তাঁদের ধাওয়া করে। ধাওয়া খেতে খেতে তাঁরা সমুদ্রতীরে এসে পৌছার পর ফেরাউনের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় দুর্বল ঈমানের কিছু লোক হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু নবী মুসা (আঃ) নিঃশঙ্কচিত্তে বলেন, "আমার রব আছেন আমার সঙ্গে, তিনিই আমায় পথ দেখাবেন।" — সূরা আল-শুয়ারা ঃ ৬২ এভাবে তিনি মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ওপর নিজের বিশ্বাস প্রদর্শন করেন। বস্তুত আল্লাহ্ সাগরের জলরাশিকে দ্বিধাবিভক্ত করে মাঝ পথ দিয়ে নবী মুসা (আঃ) ও তাঁর সহচরদের অপর তীরে পার করে দেন, আবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিধাবিভক্তি তুলে দিয়ে সাগরের জলরাশি এক করে দেন, ফলে অথৈ জলে ডুবে মরে পেছন পেছন ধাওয়া করে আসা ফেরাউন ও তার সৈন্যরা।

একজন ঈমানদার ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, আল্লাহ্কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন এবং মুমিনদের আল্লাহ্ সাহায্য করেন বলে বিশ্বাস করেন তিনি জীবনের প্রতিপদে এই রহস্যের অভিব্যক্তি দেখতে পান। সাগরের জলরাশি দ্বিধাবিভক্তিকরণের মত অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যেসব নির্দশনের কিছু কিছু আল্লাহ কোন কোন নবীকে দেখিয়েছেন। তবে বিশ্বাসীরা যদি অকৃত্রিম শুদ্ধ মননে ধ্যান করেন এবং প্রতিটি ঘটনায় আল্লাহর সৃষ্টি ও কুরআনের আয়াতসমূহ স্মরণ করেন তাহলে প্রতিটি পরিস্থিতিতেই আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার অলৌকিক অভিব্যক্তি দেখতে পাবেন।

আল্লাহ মুমিনদের অপ্রত্যক্ষ উপায়েও সাহায্য করেন

বহু আয়াতে আল্লাহ্ মুমিনদের অবহিত করেছেন তাঁদের প্রতি তাঁর সাহায্য সম্পর্কে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি আয়াতে তিনি বলেছেন, তাঁর ইচ্ছায় মুমিনদের শত্রুরা তাঁদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখতে পাবে ঃ

> অবশ্যই দুটি সেনা দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল— একটি সেনাদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল, অপর

> সেনাদলটি ছিল আল্লাহ্র বিপক্ষে। বিপক্ষের সেনাদলটি মুমিনদের সংখ্যা যা ছিল তার দ্বিগুণ দেখতে পায়। আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ সাহায্যে বলীয়ান করেন। এর মধ্যেই আছে সতর্কবানী, দেখার চোখ যাদের আছে তারা দেখতে পাবে।
>
> — সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩

আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে মুমিনদের সাহায্য করেন

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে, মুমিনদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য নানাভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, মুমিনদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, উল্টে ষড়যন্ত্রকারীরাই তাদের বিস্তার করা জালে জড়িয়ে পড়বে, মুমিনগণ কোন প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। এই মর্মে কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

> কিন্তু সত্যি যখন একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এলেন তখন তাদের প্রতিকূলতা আরো বেড়ে গেল মাত্র, তাদের ঔদ্ধত্য ও অশুভ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশ পেল। কিন্তু অশুভ ষড়যন্ত্রের বলি হয় ষড়যন্ত্রকারী নিজেই। তারা কি পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধান ছাড়া অন্য কোনরূপ বিধান প্রত্যাশা করে ? আপনি আল্লাহর বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবেন না ; আল্লাহর বিধানে কোন বিচ্যুতি ঘটবে না।
>
> — সূরা ফাতির ঃ ৪২-৪৩

> তোমাদের ভালো কিছু হলে তাদের মন খারাপ হয়ে যায়, আর তোমাদের খারাপ কিছু হলে তাদের আনন্দ আর ধরে না। তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তাদের ষড়যন্ত্রে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের কর্মধারা পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহ।
>
> — সূরা আলে-ইমরান ঃ ১২০

মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে যে কাফেরদের প্রতিকূলে গিয়ে মুমিনদের অনুকূলেই আসে তার উদাহরণস্বরূপ নবী ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন-কাহিনী উল্লেখ করা যায়। সূরা ইউসুফে বর্ণিত আছে, তাঁর ভাইয়েরা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে একটি ষড়যন্ত্র আঁটে এবং তাঁকে একটি কুয়োয় নিক্ষেপ করে। ইউসুফ যখন যুবক ছিলেন তখন যে শাসকের বাড়িতে বসবাস করতেন তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহর যে অঙ্গীকারের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার কারণে দুটি ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয় এবং ক্ষতি থেকে অব্যাহতি লাভ ঘটে। পরিশেষে আল্লাহ নবী ইউসুফ (আঃ)-কে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এসব কিছুর পর নবী ইউসুফ (আঃ) মন্তব্য করেন, কাফেরদের সব ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা ছিল অবধারিত ঃ

> (অতঃপর ইউসুফ বললেন ঃ আমি এটাই চেয়েছিলাম যে) তিনি (ইউসূফের প্রাক্তন মালিক আযীয) যেন অবশেষে জানতে পারেন যে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে আমি তাঁর খেয়ানত করিনি এবং আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত এগুতে দেন না।
>
> — সূরা ইউসূফ ঃ ৫২

ঝগড়া-বিবাদে অযথা শক্তি ক্ষয় হয়

কুরআনে উন্মোচিত আল্লাহর অন্যতম গোপন রহস্য হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার। মুমিনদের প্রতি আল্লাহর এই অনুজ্ঞা। অন্যথায় তাদের শক্তি অন্তর্হিত হবে, তাদের ঐক্য ভেঙ্গে পড়বে এবং তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রাসঙ্গিক আয়াতটি হচ্ছে ঃ

> তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা হতোদ্যম হয়ে পড়বে এবং তোমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। ধৈর্যশীল হও। আল্লাহ আছেন বিশ্বাসী ও ধৈর্যশীলদের সঙ্গে।
>
> —সূরা আল-আনফাল ঃ ৪৬

আমাদের ফুরকানী নৈতিকতা বিনয়গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যারা জীবনাচরণে কুরআনের নৈতিকতা ধারণ করেন তাঁরা বিবাদের নিষ্পত্তি করেন। সমস্যার সমাধান করেন, জনগণের জীবনযাত্রা সহজ করেন এবং লোভের মোহে আবিষ্ট হন না। কুরআনের নৈতিকতার অনুপস্থিতিতে বিবাদ ও সংঘাত অনিবার্য। এটা খুবই স্বাভাবিক যে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভিন্নমত থাকতে পারে। যেমন ধরুন একই সমস্যায় ২০ জনের ২০ রকম সমাধান থাকতে পারে এবং প্রতিটি সমাধানই নিজস্বভাবে সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। যদি প্রত্যেকেই কেবল তার সমাধানটিই সঠিক বলে জেদ ধরে তাহলে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা অবধারিত। ফলে ২০ জনের ঐকমত্যের নিষ্পত্তির বদলে বিবাদ ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খায় আল্লাহর পথে আরব্ধ ভালো কাজ বিঘ্নিত হবে, ২০ ব্যক্তির সম্মিলিত শক্তি তিরোহিত হবে এবং তাদের সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

আল্লাহর অভিপ্রায় হচ্ছে মুমিনগণ পরস্পর গভীর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তাঁরা পরস্পরের জন্য ত্যাগস্বীকার করবেন এবং সংহতি ও সহযোগিতার সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। বিশেষ করে আপৎকালে তাঁরা

আল্লাহকে স্মরণ করবেন এবং পরস্পরের প্রতি অধিক ধৈর্যশীল ও সহায়ক হবেন। বিবাদ-বিসম্বাদে শক্তি ক্ষয় হয়, কিন্তু সহযোগিতায় সম্মিলিত শক্তি বৃদ্ধি পায়। আরেকটি আয়াতে উন্মোচিত রহস্যে আল্লাহ মুমিনদের অবহিত করেছেন— তাঁরা পরস্পর বন্ধু ও রক্ষক না হলে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতিতে ছেয়ে যাবে দেশ ঃ

> কাফেরগণ একে অপরের বন্ধু ও রক্ষাকর্তা, তোমরাও যদি সেরূপ না হও (একে অপরকে রক্ষা না কর) তাহলে দেশে গোলযোগ ও দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটবে।
>
> — সূরা আল-আনফাল ঃ ৭৩

এই আয়াতগুলোর প্রতিটিতেই আল্লাহ একেকটি রহস্য উন্মোচন করে মুসলমানদের স্কন্ধে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। "ঝগড়া হয়েছে তো কি হয়েছে?" বলে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ মুসলিমদের মধ্যে যেকোন বিবাদ মানেই হচ্ছে মুসলিমদের শক্তি-হ্রাস, যার জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে মুসলিমদের। এ কারণেই প্রিয়নবী (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহকে ভয় কর। নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর। আল্লাহ নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন।"

একজন মুসলমানের উচিত নয় অন্য মুসলমানদের ছিদ্রান্বেষণ করা, বরং তার উচিত অন্য মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি সহানুভূতির সঙ্গে গোপন করা। এই ঐক্য থেকে মুমিনদের শক্তি লাভের তাৎপর্য হচ্ছে তাদের সকল শক্তি ও উদ্যম আল্লাহর দ্বীন ও কুরআনের নৈতিক আদর্শসমূহ প্রচারে নিয়োজিত করা। ঐক্যের সুবাদে তারা বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের নির্দশনসমূহ তুলে ধরতে পারে ও মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করার কাজে অখন্ড মনোযোগ দিতে পারে। অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে প্রত্যেকেই তার সেবাকার্য নির্বাহ করে মূলত লোকান্তরে অনন্তজীবন ও আল্লাহর শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের আশায়।

আল্লাহ্‌র স্মরণেই আত্মার শান্তি

মানুষ মাত্রই চায় সুখ। সুখের অন্বেষায়ই নিবদ্ধ থাকে মানুষের সকল আশা-আকাংখা। কেউ সুখ সন্ধান করে বিত্তবৈভব ও আলো ঝলমল জীবনযাত্রায়, কেউ মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তিতে, কেউ শুভবিবাহে, কেউ প্লাস্টিক সার্জারিতে, কেউবা কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তরণে। কিন্তু এসব লক্ষ্য অর্জিত হবার পরেই দেখা যায় সুখ যা পাওয়া গেল তা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। কিংবা প্রায়শ দেখা যায়, লক্ষ্য অর্জনেই কোন সুখ বা তৃপ্তি পাওয়া গেল না। আসল কথা হলো এবম্বিধ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সত্যিকার সুখ অলভ্য। কেউ পূর্ণ সুখের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে ভাবার পরেও দেখতে পায় বহু সমস্যাই তাদের বিব্রত বা মনের শান্তিভঙ্গ করছে।

সত্যিকার সুখ-শান্তি-আনন্দ ও আয়েস একমাত্র আল্লাহ্‌কে স্মরণের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। এ কথাটিই আল্লাহ বলেছেন একটি আয়াতে ঃ

> যারা ঈমান আনে ও আল্লাহর স্মরণে যাদের আত্মা তৃপ্তি পায় তারাই শান্তি লাভ করে ; কেবল আল্লাহর স্মরণেই আত্মার শান্তিলাভ সম্ভব।
>
> —সূরা আর-রা'দ ঃ ২৮

মানবজাতির উদ্দেশ্যে কুরআনে উন্মোচিত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রহস্য এটি। এ সম্পর্কে অবহিত না হয়ে বহু মানুষ এই ভেবে প্রতারিত হয় যে পার্থিব সম্পদ অর্জনেই বুঝি সুখ লাভ হয়। একদিন মরতে হবে এবং বিচারদিনের হিসেব-নিকেশের সম্মুখীনও হতে হবে, এ কথা ভুলে গিয়ে এই লোভাতুর ব্যক্তিরা জাগতিক সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ এক বড় মোহ। এ জগতের কোন সম্পদই প্রকৃত শান্তি ও সুখের সন্ধান দিতে পারে না। কেবল মুমিনগণ, যারা আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা এবং যারা তাদের প্রতি আল্লাহর দয়া, অনুকম্পা ও সুরক্ষা সম্পর্কে অবহিত, তারাই শুধু চিত্তের শান্তি — নিবিড় সৌম্যাবস্থা অর্জন করতে পারে। আল্লাহর সৃষ্টির সাক্ষ্য দেখতে পায় ও সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে যারা কেবল তাদেরই চিত্তে এই প্রশান্তি উপহার দেন আল্লাহ। অতএব অন্য কোন উপায়ে সুখ-শান্তি ও পরমার্থ লাভের চেষ্টা বৃথা।

শয়তানের চাতুরি নিতান্তই দুর্বল

হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি মানুষের সবচাইতে বড় শত্রু শয়তান। নবী হিসাবে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিলগ্নেই শয়তান প্রতিজ্ঞা করে সে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করবে এবং এই লক্ষ্যে সে নানা পরিকল্পনাও করেছে কূটকৌশল দ্বারা এই পৃথিবীকে মানুষের কাছে লোভনীয় ও মোহনীয় করে তুলবার জন্যে। কুরআনে আল্লাহ্ আমাদের অবহিত করেছেন যে, শয়তানের সব কূটকৌশল নিতান্তই দুর্বল প্রয়াস এবং মানুষের ওপর কোন প্রকার কর্তৃত্বই সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না ঃ

যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আর যারা তা আনেনি তারা সংগ্রাম করে ভুয়া বিধাতাদের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়ে যাও শয়তানের মিত্রদের বিরুদ্ধে। শয়তানের কূটকৌশল তো নিতান্তই দুর্বল।

—সূরা আন-নিসা ঃ ৭৬

> বিপথগামী ইবলিশ তাদের সঠিক মূল্যায়নই করেছিলো। আর মুমিনদের একটি দল ছাড়া তাদের সবাই তার অনুগামী হয়। তাদের ওপর তার কোন কর্তৃত্ব ছিলো না তবে কারা পরকালে বিশ্বাস করে এবং কারা তাতে সন্দেহ পোষণ করে তা চাক্ষুষ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। আপনার রব সকল বিষয়ের সুরক্ষাকারী।

—সূরা সাবা ঃ ২০-২১

আল্লাহ্ যে মানবজাতির জন্যে জাগতিক বিষয়াদি সহজ করে দিয়েছেন তারই ফল হচ্ছে শয়তানের কূটকৌশলের অকার্যকারিতা এবং মানুষের ওপরে তার কর্তৃত্বহীনতা। শয়তান হচ্ছে ধর্মের বিরুদ্ধে একমাত্র নেতিবাচক শক্তি এবং তার দুর্বলতার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মুমিনগণ কুরআনের নীতি-আদর্শ-অনুসারী হয়ে জীবন চর্চায় কোন সমস্যায় পড়বে না। তবে এজন্যে প্রয়োজন হবে অকৃত্রিম বিশ্বাস, সুদৃঢ় ঈমান। কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, যারা অকৃত্রিম বিশ্বাসে বলীয়ান শয়তানের কূটকৌশল তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ঃ

> সে (শয়তান) বলল, "হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে বিপথগামী করেছেন সেহেতু আমি তাদেরকে (মানবজাতিকে) জাগতিক বস্তুসম্ভার মোহনীয় করে দেখাব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার মুমিন বান্দা তাদেরকে নয়।"
>
> —সূরা আল-হিজর ঃ ৩৯-৪০

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ যারা ঈমান এনেছে, তাদের রবের ওপর অচলা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের ওপর শয়তান কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না ঃ

> যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর ওপর অচলা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের ওপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা শুধু তাদের ওপর যারা তাকে মিত্ররূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শরীক কল্পনা করে।
>
> —সূরা আন-নাহল ঃ ৯৯-১০০

মিথ্যা আশার কুহক ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা পরিহারের রহস্য

মুমিনদের ওপর শয়তানের প্রভাব অকার্যকর হলেও কখনো কখনো মুমিনদের কোন পাপকার্য বা ভ্রান্তিজনিত দুর্বলতার মুহূর্তে শয়তান তাঁদের কানে কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে।

শয়তানের এরূপ ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কেও আল্লাহ কুরআনে পথনির্দেশ করেছেন। আল্লাহ-ভীরু ও জান্নাত-অভিলাষী মুমিনদের জন্য এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা শয়তানের কুমন্ত্রণা মুমিনদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে অবাঞ্ছিত ও অকিঞ্চিৎকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করতে পারে। শয়তান চায় মানুষের মনে ভীতি-বিষাদ ও বিহবলতা সৃষ্টি করতে, অনৈক্যের বীজ বপন করতে এবং আল্লাহর কুরআন ও দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহানুভূতির উদ্ভব ঘটাতে আর মিথ্যা আশার ছলনায় ভোলাতে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা বর্ণনা করে নাজিলকৃত কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

"আমি তাদের বিপথগামী করব, মিথ্যা আশায় মন ভরাব, আমার আদেশে তারা গবাদিপশুর কর্ণ কর্তন করবে এবং আমার আদেশে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।" যে কেউ আল্লাহর বদলে শয়তানকে রক্ষাকর্তারূপে গ্রহণ করবে সে সবকিছুই হারিয়ে বসেছে।

সে (শয়তান) তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং মিথ্যা আশায় তাদের মন ভরিয়ে দেয়। কিন্তু শয়তানের প্রতিশ্রুতি ছলনা বই কিছু নয়।

—সূরা আন-নিসা ঃ ১১৯-১২০

(ক্ষতি করার জন্যই) মানুষের বুকে (মনে) সে কুমন্ত্রণা দেয়।

—সূরা আন-নাস ঃ ৫

শয়তান যত কুমন্ত্রণাই দিক না কেন সে মুমিনদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না যে পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর প্রদর্শিত পথে চলবেন। শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ

যদি শয়তানের কোন প্রবৃত্তি তোমাদের প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর শরণ নাও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যারা আল্লাহকে ভয় করে শয়তান যখন তাদের বিড়ম্বিত করতে চায় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়।

—সূরা আল-আরাফ ঃ ২০০-২০১

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে মুমিনগণ সর্বদা শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা শয়তানের কুমন্ত্রণা ভেবে দেখার জন্যে অযথা সময় নষ্ট করে না এবং আল্লাহ নাখোশ হবেন জেনে নৈরাশ্য, ভীতি বা বিষাদ প্রভৃতি নেতিবাচক অনুভূতি পরিহার করেন। মুমিনগণ যখনই কুরআনের নৈতিকতার পরিপন্থী কোন অনুভূতিতে আক্রান্ত হন তখন তারা এটিকে আল্লাহর বিরক্তি উৎপাদনকারী একটি শয়তানী ওয়াসওয়াসারূপে সনাক্ত করতে পারেন। তাঁরা আল্লাহকেও কুরআনের আয়াতসমূহ স্মরণ করে শয়তানের কুমন্ত্রণা বাতিল করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি আনুগত্য মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই সঠিক এই ধারণা প্রায়শই মানবজাতিকে বিভ্রান্ত করে। বস্তুত কোন কাজের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে প্রায়ই লোকে বলে, "কারণ বেশির ভাগ লোকই এ কাজ করে।" কিন্তু আল্লাহ আমাদের অবহিত করেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বিপথে পরিচালিত করে ঃ

> আপনি যদি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে। তারা শুধু অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করে, মনগড়া কথা বলে।
>
> —সূরা আল-আনআম ঃ ১১৬

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না ঃ

> কিন্তু আপনি যতই আগ্রহান্বিত হন না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না।
>
> —সূরা ইউসুফ ঃ ১০৩

সূরা আল-মায়িদায় আল্লাহ মন্দের প্রাচুর্যের বিষয়ে উল্লেখ করে ধীমানদের বলেছেন তা পরিহার করতে ঃ

> আপনি তাদের বলুন ঃ 'ভাল আর মন্দ সমান নয়, যদিও মন্দই মোহনীয়রূপে প্রতিভাত হয়ে তোমাদের কাছে টানে।' আল্লাহকে ভয় কর, হে ধীমানগণ, তাহলেই তোমরা কামিয়াব হবে।
>
> —সূরা আল-মায়িদা ঃ ১০০

ফলত সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্ম, প্রতীতি বা প্রণোদনা কখনো নির্ভরযোগ্য সূত্র বা মানদন্ড হতে পারে না। মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠকে অনুসরণ করতে চায়, "যূথ প্রবৃত্তি"-র প্রেরণায় বা গড্ডলিকা প্রবাহে। মুমিনেরা কুরআনে উন্মোচিত এই ঐশী রহস্য অনুসারে গড্ডলিকা প্রবাহে চালিত না হয়ে কেবল আল্লাহর আদেশ ও তাঁর ধর্মের বাণী মান্য করে চলেন। তাঁরা যদি বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়েন একলা চলতে বাধ্য হন, তবু তাঁরা কখনো তাঁদের বিশ্বাস ও অনুসৃত পথ সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না।

আল্লাহর রহমত সঙ্কোচন ও প্রসারণের রহস্য

আল্লাহ কাউকে কেন নিয়ামত দান করেন কিংবা প্রদত্ত নিয়ামত প্রত্যাহার করেন তার কারণ ব্যাখ্যা করেন কুরআনে ঃ

> তার কারণ আল্লাহ কখনো কোন জাতিকে প্রদত্ত নিয়ামত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জাতি তার নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
>
> —সূরা আল-আনফাল ঃ ৫৩

> প্রত্যেক মানুষের সামনে-পেছনে একদল করে ফেরেশতা রয়েছেন যারা আল্লাহর হুকুমে তার প্রহরায় নিযুক্ত। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে-জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে। আল্লাহ কোন জাতির ওপর গজব নাজিল করতে চাইলে কেউ তা এড়িয়ে যেতে পারবে না। তিনি ছাড়া তাদের আর কোন রক্ষাকর্তা নেই।
>
> —সূরা আর-রা'দ ঃ ১১

এই আয়াতগুলোতে উন্মোচিত গুরুত্বপূর্ণ রহস্যগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ কিংবা অবহেলাকারী। আল্লাহ বলছেন ঃ যারা পুণ্য কাজে ব্যাপৃত হয় তিনি তাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত বাড়িয়ে দেন ; পক্ষান্তরে পাপাচারীদের প্রতি তাঁর নিয়ামত সঙ্কুচিত হয়। কোন জাতির আমল ও ঈমানের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার প্রাপ্ত নিয়ামতেরও পরিবর্তন ঘটে।

মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর এই রহস্য সম্পর্কে অবহিত তাঁরা সকল পরিস্থিতিতেই আল্লাহর সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেন ও এ বিষয়ে সচেতন থাকেন। তাঁরা আত্মতৃপ্তিতে মগ্ন না হয়ে সদা সচেষ্ট হন কুরআনে বর্ণিত নৈতিক পূর্ণতা অর্জনে এবং তাঁদের ভুলত্রুটি সংশোধনে। তাদের আচরণে উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়।

রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আনুগত্য আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সামিল

আল্লাহ কুরআনে মুমিনদের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যেসব এবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন তার একটি হচ্ছে, তাঁর রাসূলদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। আল্লাহ্ বলেন ঃ তিনি যুগে যুগে রাসূলদের পাঠিয়েছেন বিশ্বাসীদের আনুগত্য লাভের জন্য এবং এই আনুগত্যের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন বিশ্বাসীদের। রাসূলগণ হচ্ছেন আল্লাহর বাণী ও আহকাম প্রচারের জন্য এবং বিচারদিন সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রকাশের জন্য প্রেরিত পুরুষ। তাঁরাই হচ্ছেন সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠতম ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত আল্লাহর দূত ; তাঁদের কর্মকাণ্ড, মনোবৃত্তি ও নীতিপরায়ণতা মানবজাতির জন্যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তস্থানীয়। তাঁরা আল্লাহর বন্ধু, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মিত্র।

> যে কেউ রাসূল (সঃ)-এর প্রতি অনুগত সে আল্লাহর প্রতিও অনুগত। যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় (তবে জেনে রাখুন) আমি আপনাকে তার রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি।
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ৮০

আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)-ও বলেছেন ঃ যারা এই সত্যমূলে সাক্ষ্য দেয় তাদের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ ঃ

> আপনারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নেই ও আমি তাঁর রাসূল, নয় কি ? যদি তা-ই হয় তাহলে আপনাদের জন্য সুসংবাদ। কুরআন এমন একটি রজ্জু যার একপ্রান্ত আল্লাহর কাছে পৌছে, আর অপর প্রান্ত পৌছে আপনাদের কাছে। এই প্রান্ত শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন। তাহলে কোন ভ্রান্তি বা বিপদে পড়বেন না।[৮]

কোন রাসূলের প্রতি অবাধ্যতা হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সরাসরি অবাধ্যতা। আল্লাহ কর্তৃক কুরআনে উন্মোচিত গুরুত্বপূর্ণ রহস্যগুলোর অন্যতম

এটি। যারা রাসূলের প্রতি অনুগত এবং যারা তা নয় তাদের অবস্থা আল্লাহ বিবৃত করেছেন কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে ঃ

> এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে মান্য করে, তাদের আমরা জান্নাতের উদ্যানে দাখিল করবো, যার তলদেশে জলধারাসমূহ বহমান। সেখানেই তারা থাকবে চিরদিন, অনন্তকাল। সেটাই হবে মহান বিজয়। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষকে অমান্য করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে তাদের আমরা নিক্ষিপ্ত করবো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। সেখানেই তারা থাকবে চিরদিন, অনন্তকাল। অবমাননাকর এ শাস্তিই তাদের প্রাপ্য।
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ১৩-১৪

রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আনুগত্য বিষয়ে আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সত্যিকার আনুগত্য ও বশ্যতা কি রকম হবে এবং কোন প্রকার আনুগত্য তাঁর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতের প্রেক্ষাপটে এটা পরিষ্কার যে দ্বীনের সকল কর্তব্য সম্পাদন ও দ্বীনের সেবায় পূর্ণ আত্মোৎসর্গই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ কুরআনে যেভাবে নির্দেশ করেছেন সেভাবে রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও নৈতিকতা গ্রহণে যদি কেউ ব্যর্থ হয় এবং তার আনুগত্যে যদি অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় তাহলে হয়তো আল্লাহ তার সব কাজই নাকচ করে দেবেন। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি আয়াত নিম্নে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হল ঃ

রাসূল (সঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার না করা পর্যন্ত তারা মুমিন নয়

সূরা আন-নিসার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ঃ

> না, আপনার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আপনাকে বিচারক মানে এবং তারপর আপনি যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধাসংশয় বোধ না ক'রে সর্বান্তকরণে তা গ্রহণ করে।
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫

এই আয়াতে নবীর প্রতি আদর্শ আনুগত্য সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রায় সব লোকেরই আনুগত্য বিষয়ে সাধারণ ধারণা আছে। কিন্তু রাসূল-এর প্রতি আনুগত্য মানুষের জানা অন্য সব ধরনের আনুগত্য থেকে একেবারেই ভিন্ন ধরনের। উপরের আয়াতে আল্লাহ যেমন বলেছেন, রাসূল (সঃ)-কে মান্য করতে হবে সর্বান্তঃ করণে, মনে মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহপোষণ না করে এবং কোন রকম দ্বিধা না রেখে। যদি রাসূল (সঃ)-এর সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্পর্কে কারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তার নিজের ধারণা রাসূল (সঃ)-এর ধারণার চাইতে সঠিকতর মনে হয়, তাহলে উপরোক্ত আয়াত অনুসারে সে প্রকৃত মুমিন নয়।

প্রকৃত ঈমান ও আনুগত্যসম্পন্ন মুমিনেরা জানেন রাসূল (সঃ) যা বলেন তা-ই তাদের জন্যে সর্বোত্তম। তাঁর সিদ্ধান্ত তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপন্থী হলেও তাঁরা সানন্দে ও সোৎসাহে তা গ্রহণ করেন। এই প্রকার পুণ্য আচরণ সাচ্চা ঈমানেরই প্রতীক এবং যারা এরূপ পূর্ণ আনুগত্যের সঙ্গে রাসূল (সঃ)-কে মান্য করেন তাঁদেরকেই মুক্তির সুসংবাদ দেন আল্লাহ। যেসব আয়াতে আল্লাহ এই মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

> যারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর অনুগত তারা সঙ্গী হবে আল্লাহর অনুগৃহীত ব্যক্তিদের তারা হচ্ছেন আল্লাহর নবীগণ, সৎ ব্যক্তিগণ, সাক্ষীগণ ও সুকৃতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ। কি অপূর্ব সঙ্গী এরা!
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ৬৯

> যারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর অনুগত এবং আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়া অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।
>
> —সূরা আন-নূর ঃ ৫২

> আপনি তাদের বলুন ঃ 'আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দূত (রাসূল) (সঃ)-এর প্রতি অনুগত হও। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে (এ-ই শুধু বলতে পারি) রাসূল (সঃ)-এর উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনি জবাবদিহি হবেন আর তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা। রাসূল (সঃ)-এর প্রতি অনুগত হলে তোমরা

> সৎপথে পরিচালিত হবে। রাসূল (সঃ) তো শুধু আল্লাহর বাণী স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়ার জন্যে দায়ী।
>
> —সূরা আন-নূর ঃ ৫৪

বলা হয়েছে যারা রাসূল (সঃ)-এর অনুগত হবে তারা সৎপথে পরিচালিত হবে। ইতিহাসের সকল পর্যায়ে মানুষ পরীক্ষিত হয়েছে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষায়। আল্লাহ্ যুগে যুগে মানব সমাজে তাঁর দূত নির্বাচন করেছেন। কিন্তু সমাজের কিছু সঙ্কীর্ণ-মনা ও জড়বুদ্ধি লোক বুঝে উঠতে পারেনি কেন তারা তাদেরই মত একজন লোকের কথা শুনবে কিংবা তাদের চাইতে বিত্তশালী নয় এমন একজন লোকের অনুগত হবে। তবু আল্লাহ তাঁর দূতদের নির্বাচন করেছেন, তাঁদের সমর্থন যুগিয়েছেন এবং তাঁদের প্রজ্ঞা ও পরাক্রম দিয়েছেন। সারকথা আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে নির্বাচন করেন। এ কথাটাই মূঢ়জন হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম। সাচ্চা মুমিনেরা আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিকে সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তাঁরা জানেন যতবার তাঁরা রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন ততবারই তাঁরা আল্লাহর প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করছেন। যারা আল্লাহ ও দ্বীনের অনুগত তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দূতেরও অনুগত। যারা আল্লাহর অনুগত তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

> না, ওই দাবি সত্য নয়! যারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং যুগপৎ সৎকর্মব্রতী, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের পুরস্কার। তারা কোনরূপ শঙ্কাবোধ করবে না এবং কোনরূপ দুঃখতাপ তাদের স্পর্শ করবে না।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ১১২

যাদের কণ্ঠস্বর রাসূল (সঃ)-এর কণ্ঠস্বরের উর্ধ্বে ওঠে তাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়

কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

> হে মুমিনগণ! তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের চাইতে উচ্চতর করো না এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে যেমন উচ্চৈঃস্বরে কথা

বলো নবীর সাথে তেমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, অন্যথায়, তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট হবে। যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের কণ্ঠস্বর নমিত করে আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ তাকওয়ার জন্যে পরিশুদ্ধ করে দেন। তারা ক্ষমা ও অপরিমেয় পুরস্কার পাবে।

—সূরা আল-হুজুরাত ঃ ২-৩

আল্লাহর নবীগণ সর্বদা মুমিনদের সঠিক ও সুন্দরতম পথে আমন্ত্রণ জানান। অবশ্য কোন কোন সময় নবীদের এই আমন্ত্রণ তাঁদের জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যারা নবীকে বিশ্বাস করে ও মান্য করে তারা বিচলিত হয় না বরং আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয় ও কুরআনের বাণী অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যাদের ঈমান দুর্বল কিংবা যারা প্রবৃত্তির দাস তারা নবীর আমন্ত্রণ অবজ্ঞা করতে পারে। তাদের কণ্ঠস্বর, বক্তব্য ও ভাষা তাদের চিত্তের রুগ্নতা ও আনুগত্যের দৌর্বল্য প্রকাশ করতে পারে। তারা নবীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে ও তাঁর চাইতে উচ্চতর কণ্ঠে কথা বলতে পারে। আল্লাহ বলেছেন ঃ তাদের সব কর্মফল বিনষ্ট হবে এবং তারা যদি দ্বীনের নৈতিক আদর্শ প্রচার ও প্রসারে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমও করে তবুও তাদের সে প্রয়াসও তাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না ওই অবাধ্যতার কারণে।

কুরআনের বহু আয়াতে উন্মোচিত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ রহস্য এটি। আল্লাহ মানবজাতিকে আদেশ করেছেন উত্তম কার্যে নিয়োজিত হতে, সাগ্রহে ও দৃঢ়তার সাথে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে, কুরআনে নির্দেশিত নৈতিক আদর্শসমূহ অনুসারে জীবনযাপন করতে এবং উদার ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সৎ ও ঈমানদার হতে। নিঃসন্দেহে এসবই হচ্ছে এবাদতের বিভিন্ন রূপ এবং এগুলোই হবে তাঁর লোকান্তরে জীবনপথের পাথেয়। কিন্তু সূরা আল-হুজুরাতে আমরা দেখেছি আল্লাহর রাসূলের প্রতি অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণমূলক একটিমাত্র কাজ অন্য সকল ভালো কাজের সুফল বিনষ্ট করে দেবে। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আল্লাহর রাসূলদের সম্মানপ্রদর্শন ও তাঁদের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব।

রাসূল (সঃ)-এর আদেশ অমান্য করে যারা, তাদের শক্তি কেড়ে নেন আল্লাহ

তালুত ও তাঁর সেনাবাহিনী সম্পর্কিত কুরআনে বর্ণিত ঘটনাটি আল্লাহর রাসূলদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে আরেকটি অনুস্মারক। কুরআনে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল তালুত তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে যাবার পথে সৈন্যদের সাবধান করেছিলেন সামনে যে নদী পড়বে তার পানি যেন কেউ পান না করে। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

> সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হবার পথে তালুত বললেন, "আল্লাহ তোমাদের একটি নদী দিয়ে পরীক্ষা করবেন। যারা সে নদীর পানি পান করবে তারা আমার নয়, যারা পান করবে না তারা অবশ্যই আমার। তবে কেউ তার করপুটে সামান্য পানি তুলে পান করলে দূষণীয় হবে না। কিন্তু অল্প সংখ্যক সৈন্য ছাড়া বাকী সবাই নদীর পানি পান করলো। অতঃপর তালুত ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নদী অতিক্রম করার পর তারা বলল, 'আজ আমাদের জালুত ও তার বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার মতো শক্তি নেই।' কিন্তু যাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই তারা বলল, "আল্লাহর অনুমতিতে কতবার ক্ষুদ্র বাহিনী বিজয়ী হয়েছে বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে!' আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪৯

আয়াতটির মর্মার্থ এই যে, যারা তালুতের নির্দেশ অমান্য করল তারা শক্তিহীন হয়ে পড়ল, দুর্বল হয়ে গেল, কিন্তু যারা তালুতের নির্দেশ মান্য করলো আল্লাহ তাদের তওফিক দিলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তারা সংখ্যায় স্বল্পসংখ্যক হয়েও বিরাট শত্রুবাহিনীকে পর্যদুস্ত করলো। মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ কুরআনে উন্মোচন করেছেন এসব রহস্য। শক্তি, বিজয় ও শ্রেষ্ঠত্ব- বস্তুগত সম্পদ, মর্যাদাশীল অবস্থান, সংখ্যা গরিষ্ঠতা অথবা বাহুবলের ওপর নির্ভরশীল নয়। যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকে আল্লাহ তাদের অন্যদের চাইতে শক্তিশালী করেন এবং তাদের অপরিমেয় উপহারে পুরস্কৃত করেন ; যথা ঃ জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, নিয়ামত ও সম্পদ। যারা আল্লাহর রাসূলদের অনুগত সহচর হন তাঁদের জন্যে রয়েছে পরলোকে সুন্দর অনন্তজীবন।

মুমিনদের ক্ষুদ্রকায় বাহিনী কাফিরদের বিশাল বাহিনী পরাভূত করতে পারে

মুমিনদের জন্যে আল্লাহর একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তারা সবসময় তাদের (বিপুল সংখ্যাগুরু) বিরোধীদের পর্যুদস্ত করতে পারে। কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ রহস্যটি উন্মোচন করেছেন যা কাফিরদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তালূতের কাহিনীতে আমরা দেখেছি, আল্লাহর প্রেরিত নবীদের প্রতি আনুগত্যের কারণে আল্লাহ্ মুমিনদের বিজয়ী করেছেন যদিও তারা ছিল সংখ্যালঘু। তালূতের কাহিনীর উপসংহারে একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

> "আল্লাহর অনুমতিতে কতবার ক্ষুদ্র বাহিনী বিজয়ী হয়েছে বৃহৎ বাহিনীর বিরুদ্ধে! আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪৯

আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা থাকায় পরাক্রম লাভ করেন মুমিনেরা

এই গ্রন্থে বারবার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। এই রহস্যগুলোর একটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা থাকা সম্পর্কিত। আল্লাহ এই সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা একনিষ্ঠ তারা বলবত্তর হবে। এ কথাটি মাথায় রাখতে হবে যে, সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। এমনকি যে আল্লাহ্‌র বিরোধী তার শক্তিও বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শক্তি। আল্লাহ্ মানুষকে কয়েকটি কর্মক্ষমতা অর্পণ করেন তাদের পরীক্ষা করার জন্যে। তিনি যেমন দান করেন চাইলে তেমনি সহজে ফিরিয়েও নিতে পারেন। আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন, যারা তাঁর প্রতি দৃঢ়

আস্থাবান থাকবে তারা শক্তিমান হবে, অর্থাৎ তিনি তাদের শক্তিদান করবেন ঃ

হ্যাঁ অবশ্যই! কিন্তু তোমরা যদি একনিষ্ঠ হও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর তাহলে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের রব সাহায্য করবেন।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১২৫

উদ্ধৃত সূরাটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ চাইলে মানুষকে অজ্ঞেয় উপায়ে বিজয়ী করে দিতে পারেন। দ্বীনের পতাকা সমুন্নত রাখার প্রয়াসে উদ্দীপিত কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ অজ্ঞাতভাবে সমর্থন দিয়ে তাকে এমন প্রেরণাদায়ক ভাষণ দিতে সক্ষম করতে পারেন যার প্রভাবে শ্রোতাদের মনের পরিবর্তন হয়, তারা দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে কেউ বিজয় লাভ করতে কিংবা অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে না। সকল সদগুণ, বিজয় ও অনুপ্রেরণার মালিক স্বয়ং আল্লাহ্। মানবজাতির ওপরে আল্লাহর যে নির্দেশনা রয়েছে তা হচ্ছে তাঁর হুকুম-আহকাম তামিল করা ও তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন না করা।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ মুমিনদের জানাচ্ছেন ঃ

হে নবী! আপনি মুমিনদের যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন লোক থাকে যারা একনিষ্ঠ, তা'হলে তারা দু'শ জনকে পরাভূত করবে ; আর যদি থাকে একশ জন, তারা পরাভূত করবে এক হাজার কাফেরকে, কারণ তারা এমন লোক যাদের অনুভব-শক্তি নেই।

তোমাদের দুর্বলতা জেনে আল্লাহ্ এখন তোমাদের বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যদি একশ জন থাকে যারা একনিষ্ঠ, তারা পরাভূত করবে দু'শ জন, আর যদি থাকে এক হাজার জন তারা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে পরাভূত করবে দুই হাজার জন। আল্লাহ আছেন একনিষ্ঠদের সঙ্গে।

—সূরা আল-আনফাল ঃ ৬৫-৬৬

উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঈমানদারদের যদি নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা না থাকে, যদি তারা ঈমানে ও তাকওয়ায় অবিচলিত থাকে তাহলে তাদের একজনের শক্তি হবে (কাফেরদের) দশজনের সমান। এখানে 'শক্তি' বলতে শুধু পেশীশক্তি বোঝায় না, কথাটির অন্যবিধ তাৎপর্যও রয়েছে। যেমন, মানুষের কাছে দ্বীনের নৈতিকতার আদর্শের বাণী পৌঁছে দেবার এবং আল্লাহ্র পথে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে একজন মুমিনের তৎপরতা দশজন কাফেরের তৎপরতার সমান হতে পারে ; একজন মুমিনের জ্ঞান দশজন কাফেরের সমান হতে পারে। শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কৃত একজন মুমিনের একটি কাজ দশজনের সম্মিলিত প্রয়াসে কৃত কাজের সমান। একজন মুমিন এককভাবে দশজন বিপথগামী ব্যক্তিকে আল্লাহ্র পথে চলার আহ্বান জানিয়ে তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করতে পারেন। দশজন কাফেরের প্রচারিত ভ্রান্তমত নস্যাৎ করে তার স্থলে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন মাত্র একজন মুমিন।

কুরআনে উন্মোচিত এই রহস্যটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, যদি সকল মুসলমান পরস্পরকে সত্যপথে আগুয়ান হতে অনুপ্রাণিত করেন তাহলে তাঁরা সংখ্যায় যত ক্ষুদ্রাকৃতিরই হন না কেন আল্লাহ্ তাঁদের সকল প্রয়াসে কামিয়াব করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি সারা পৃথিবী বেদ্বীন লোকে ভরে যায় এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাপকগণ প্রতিটি দেশের মানুষকে কুফরির পথে পরিচালিত করে, তাহলে মানুষকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্যে আল্লাহ্ মুসলিমদের এমন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠি গড়ে দিতে পারেন যারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পরাক্রান্ত, জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। আল্লাহ্ মুসলিমদের বিষয়াদি সহজ করে দেন, কিন্তু কাফেরদের জন্য সবকিছু কষ্টসাধ্য করে দেন। মুমিনদের মধ্যে যারা এ রহস্যটি সম্পর্কে অবহিত তাঁদের কোন মতেই উচিত নয় নিজেদের কোন কাজ খাটো করে দেখা কিংবা এ রকম আক্ষেপ করা যে, "কি হবে আমার এই তুচ্ছ প্রয়াসে, অবস্থার কোন হেরফের হবে কি এতে ?" তাঁদের বরং আশ্বস্ত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কৃত যেকোন কাজ, ছোট-বড় যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ্ তা কামিয়াব করে দেন। আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর অকৃত্রিম আস্থা, আল্লাহ্র পথে

মানুষকে আহবান কিংবা কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধকে তুলে ধরবার জন্য যেকোন কাজ বহু মানুষকে আত্মার মুক্তির পথে নিয়ে আসতে পারে, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্র প্রতি তাকওয়া ও ভালোবাসার আলো জ্বেলে দিতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই দুনিয়ার যত বিধি-বিধান ও কার্যকারণ শৃঙ্খলাজনিত ঘটনাপরম্পরা তা সবই আল্লাহ্ কুরআনের মাধ্যমে যা বিবৃত করেছেন তদনুরূপ। যে কেউ কুরআন অনুসারে চিন্তা করেন, তিনি আল্লাহর সৃষ্টির এই রহস্যাবলী অনুধাবন করতে পারেন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় মানুষের সাধ্যের অধিক জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করতে পারেন। আল্লাহ্ মুমিনদের এই সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁরা ঈমানে অবিচলিত থাকলে কাফেরদের ওপর বিজয়ী হবেন ঃ

> তোমরা হাল ছেড়ে দিও না, হতোদ্যম হয়ো না। পরিশেষে তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও।
>
> —সূরা আল-ইমরান ঃ ১৩৯

এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে সফলকাম হবার জন্যে অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, পরিপূর্ণ ঈমান। প্রাসঙ্গিক অন্য একটি আয়াতে কুরআনে উন্মোচিত আরেকটি রহস্য হচ্ছে আল্লাহর কোন শরীক নাই এই বিশ্বাসে অটল থাকা।

আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির দ্বীনকে সুদৃঢ় করেন যে একা তাঁর এবাদত করে

একজন মুসলিমের ইহজীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে কুরআনের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া যাতে মানুষ সেভাবে আল্লাহ্র খিদমত করতে পারে যেমন তার করা উচিত। আল্লাহ মুমিনদেরকে কুরআনে এই লক্ষ্য অর্জনের পথ দেখিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন ঃ

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মে নিরত আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে এই ভূমিতে উত্তরাধিকারী করবেন যেমন তিনি উত্তরাধিকারী করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং অবশ্যই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। অধিকন্তু তাদের ভয়ের স্থলে দেবেন নিরাপত্তা। তারা আমারই এবাদত করে, আমার কোন শরীক সাব্যস্ত না করে। এরপরও যারা ঈমান আনবে না তারাই-তো পথভ্রষ্ট।
>
> —সূরা আন-নূর ঃ ৫৫

মুমিনদের বরাবরে উন্মোচিত একটি রহস্য অনুসারে আল্লাহ্ সারাবিশ্বে কুরআনের মূল্যবোধগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, যদি মুমিনগণ আল্লাহ্র কোন শরীক সাব্যস্ত না করে শুধু তাঁরই আরাধনা করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই রহস্যে প্রত্যেক মুমিনের ওপর দায়িত্ব বর্তায় সমগ্র মানব জাতির কাছে কুরআনের পথনির্দেশ পৌঁছে দেয়া।

সুতরাং বিবেকবান সকল মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্র কোন শরীক কল্পনা করা কঠোরভাবে পরিহার করে শুধু তাঁরই এবাদত করা। সর্বোপরি, আল্লাহর কোন শরীক সাব্যস্ত করা এমন একটি পাপ যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না এবং যার পরিণাম হবে পাপাচারীর জন্য জাহান্নাম। অনেকে এই পাপাচারের

(শির্ক) অপবাদ দেন শুধু ওই বিধর্মীদের, যারা মূর্তিপূজক। কিন্তু মানবজাতিকে "প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিকতা" সম্পর্কেও সতর্ক হতে হবে।

এই ধরনের পৌত্তলিকতায় কোন ব্যক্তি বিনাবাক্য ব্যয়ে আল্লাহ্‌তে ঈমান আনতে পারে, তাঁকে আল্লাহ্ ও স্রষ্টা মানতে পারে এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সঙ্গোপনে মনে মনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যতর কোন আধিদৈবিক সত্তাকে ভয় করা, অন্য লোকদের অনুমোদন ও সমর্থন বেশি জরুরী জ্ঞান করা এবং পরিবার-আভিজাত্য এবং বাণিজ্যকে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রদর্শিত পথের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভাবা নিখাদ পৌত্তলিকতা মাত্র। কুরআনে বর্ণিত ঈমানের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলের ও সবকিছুর প্রতি মমত্ববোধ শুধু আল্লাহ্‌কে পাবার পথের পাথেয়রূপে বিবেচিত হতে পারে না। কোন মানুষ যদি অপর কোন মানুষের একটি অনুগ্রহের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তাকে নিজের রক্ষাকর্তা ভাবে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে, সে একজন পৌত্তলিক। কারণ একমাত্র আল্লাহ্ই সকল মানুষের সর্বপ্রকার জীবিকার সংস্থান করেন ; একমাত্র আল্লাহই সকল জীবিত সত্তার আহার-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন এবং কেবল তিনিই তাদের রোগ নিরাময় করে সুস্থ জীবন দান করেন। আল্লাহ্ চাইলে একজন রুগ্ন ব্যক্তিকে ডাক্তারের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে পারেন। এই অর্থে শুধু ডাক্তারের ওপর সকল আশা-ভরসা নির্ভর করা অযৌক্তিক। কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোন ডাক্তারের সাধ্য নাই রোগীকে রোগমুক্ত করা। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর ডাক্তার সম্পর্কে রোগীর দৃষ্টিভঙ্গি হবে এরূপ যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে ডাক্তার চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তুলেছেন, কাজেই ডাক্তারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু তাঁকে তো আসলে রোগমুক্ত করেছেন আল্লাহ, কাজেই কৃতজ্ঞ হতে হবে শুধু আল্লাহর কাছে। অন্যথায় তিনি অন্যকে আল্লাহ্‌র একজন শরীক সাব্যস্ত করে ফেলবেন ; আল্লাহ্‌র একটি গুণও সেই শরীকের ওপর আরোপ করে ফেলবেন সেই সুবাদে। সকল মুসলমানেরই অবশ্য কর্তব্য প্রচ্ছন্ন পৌত্তলিকতা বর্জন এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন মিত্র, অন্তরঙ্গ সহচর ও রক্ষাকর্তার কল্পনা পরিহার করা।

আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর

মানবজাতির বৃহদংশই এই সংসার জীবনে এমন আসক্ত আর মোহমুগ্ধ যে, এ জীবন থেকে একদিন বিদায় নিতে হবে এ কথাটি কখনও তাদের চিন্তায়ই আসে না ; তারা দ্বীনের কথা ভাবে না, মৃত্যুর অমোঘতা বিষয়ে চিন্তা করে না, পরকালের অনন্ত জীবনের কথা না ভেবে নিশ্চিন্ত মনে কেবল ইহকালের সুখভোগের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তাদের প্রিয় এই জীবনের আয়ুষ্কাল খুবই স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী। আয়ুষ্মান যারা তাদেরও একদিন মরতে হবে। আল্লাহ্ মানবজাতির কল্যাণে এই রহস্যটি উন্মোচন করেছেন কুরআনের বহু আয়াতে ঃ

> তিনি প্রশ্ন করবেন, 'তোমরা কত বছর পৃথিবীতে ছিলে ?' তারা বলবে, 'আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ সেখানে ছিলাম ; যারা গুণতে সক্ষম তাদের জিজ্ঞেস করুন !' তিনি বলবেন, 'তোমরা সেখানে খুব স্বল্পকালই ছিলে, সেটা তোমরা বুঝতেই পার নাই। তোমরা কি মনে কর আমি শুধু খেলাচ্ছলেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনও ফিরে আসতে হবে না আমার কাছে ?'
>
> —সূরা আল-মুমিনুন ঃ ১১২-১১৫

> বিচার দিনে যখন অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হবে, তখন বিপথগামিরা শপথ করে বলবে পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকাল পুরো এক ঘন্টাও ছিল না। অতটা বিপথগামীই তারা ছিল।
>
> —সূরা আর-রুম ঃ ৫৫

উদ্ধৃত আয়াতগুলো হচ্ছে বিচারদিনে হিসাব-নিকাশের জন্য সমবেত মানুষের সংলাপ। সংলাপগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর পরে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, পৃথিবীতে তারা ছিল খুবই স্বল্প সময়। এই পৃথিবীর জীবনে যে সময়কাল ছয় সাত যুগ মনে হত আসলে তা ছিল মাত্র

একদিন কিংবা তার থেকেও অনেক কম। এটা সেই রকম যখন কোন মানুষ স্বপ্নে দেখলো সে কোথাও কিংবা কোন কাজে বহুদিন/ মাস/ বছর অতিবাহিত করেছে, কিন্তু ঘুম ভাঙার পরেই সে বুঝতে পারে আসলে সে মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্বপ্ন দেখছিল।

একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই পার্থিব জীবনের স্বল্পতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যেমন, প্রত্যেকেই তার জীবনের জন্য কিছু পরিকল্পনা করে ও লক্ষ্য স্থির করে, কিন্তু এগুলো কখনো শেষ হয় না, একের পর এক আস্তেই থাকে। হাইস্কুলের পাঠশেষে কলেজে যাওয়া, সেখানে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কোন কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ করা। কিন্তু এ-সবই অতিদ্রুত অতিক্রান্ত সময়ের অভিজ্ঞতা। বাল্যকালে কেউ ত্রিশের তারুণ্যে পৌঁছবার কথা ভাবে না, অথচ খুব বেশিদিন লাগে না তার চল্লিশে পৌঁছে যেতে।

পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব একটি ধ্রুব সত্য। এ সত্যটি আল্লাহ্ কুরআনে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা যে-কোন ব্যক্তি মৃত্যুর আগে অনুধাবনে সক্ষম হবে। যারা অনুধাবন করতে সক্ষম তাদের জন্য এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পরকালের প্রকৃত ও অনন্ত জীবনকে উপেক্ষা করা অনুচিত কাজ হবে। মানবজাতির প্রতি পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের প্রতি হুঁশিয়ারী সম্বলিত কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

> 'হে আমার বান্দাগণ! ইহজীবন হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী আবাস। পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়িত্বের নিবাস।'
>
> —সূরা গাফির ঃ ৩৯

> এই লোকগুলো এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়েছে, আর মহাজীবনের ভাবনার প্রতি পিছন ফিরে আছে।
>
> —সূরা ইয়াসিন ঃ ২৭

আল্লাহ্ কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন

কুরআনের বহু আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয় ঃ

> আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের কাছে প্রকাশ করলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদের দৃঢ়চিত্ত করো। কাফেরদের অন্তরে আমি আতঙ্কের সৃষ্টি করবো।...."
>
> —সূরা আল-আনফাল ঃ ১২

> তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা গাফেল তাদেরকে প্রথমবারই একত্র করে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। তোমরা ভাবতেও পারনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে, আর তারা ভেবেছিলো, তাদের দুর্গগুলোই তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ্র অভিপ্রায় থেকে। কিন্তু আল্লাহ্র গজব তাদের ওপর এমন দিক থেকে এসে পৌছলো যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন আল্লাহ্। তাদের ঘর-বাড়ি তাদের নিজের হাতে এবং মুমিনদের হাতে চুরমার হয়ে গেলো। যাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে এ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
>
> —সূরা আল-হাশর ঃ ২

এই আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা আল্লাহ্র একটি রহস্যের বয়ান। যারা মুমিনদের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ ও দ্বীনের নৈতিকতা প্রতিরোধ করে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে তাদের হীনবল করেন। এই আয়াতগুলো গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করে তা থেকে নিজেদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কারণ, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের হৃদয় আল্লাহ্র কাছে ন্যস্ত এবং আল্লাহ্ যার হৃদয়ে যে ভাব সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করেন তাই করতে

পারেন। মুমিনদের কর্তব্য অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করা নয়, বরং নিজের ঈমান ও তাকওয়ায় আন্তরিক হওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে কুরআনের আলোকে কোন ব্যক্তিকে সতর্ক করা। কিন্তু সতর্কবাণীটি যত প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টই হোক না কেন সে ব্যক্তি তা গ্রাহ্য করবে না, যদি না আল্লাহ্ সেরূপ ইচ্ছে করেন। একজন মুমিন বিপদে অসহায় বোধ করতে পারে এবং শত্রুকে ভীতি প্রদর্শনের কোন শক্তি তার নাও থাকতে পারে।

কিন্তু আল্লাহ্ই তাকে সমর্থন ও সুরক্ষা দেবেন যদি তার চিত্ত ঈমানে সুদৃঢ় হয় ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসে দৃঢ় সংকল্প থাকে। উদ্ধৃত আয়াতগুলোর আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আল্লাহ্ শত্রুপক্ষের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে দেবেন এবং তারা নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান গোলযোগ নিবারণেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। এভাবেই আল্লাহ্ শত্রুকে ত্রাস দিয়ে মুমিনকে পরিত্রাণ করেন।

আল্লাহ্ কাফেরদের অন্তরে নানাবিধ ভীতি সৃষ্টি ও ত্রাস সঞ্চার করেন। তারা মৃত্যু ভয়ে, ভবিষ্যতের ভয়ে, আঘাতের ভয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে এবং বিত্তহানির ভয়ে ভীত। এর মধ্যে মৃত্যু-ভয়টাই সবচেয়ে বড় ও উদ্বেগজনক, কারণ কাফেররা তো পরকাল বিশ্বাস করে না, ইহকালই তাদের সর্বস্ব। মৃত্যুর পর তাদের বিত্তবৈভব সব পড়ে থাকবে কিন্তু তারা তো শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এ রকম পরিণাম চিন্তায় ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয় কাফেরদের অন্তর। ফলে তারা ক্রমে ক্রমে দেহ-মনে হীনবল হয়ে পড়ে।

আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন, কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করা হয়। কেননা তারা তাঁর শরীক কল্পনা করে। তাদের পরিণাম সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> আমি কাফেরদের অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি করবো। কেননা তারা আল্লাহর এমন শরীক কল্পনা করেছে যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড। কি জঘন্য তাদের আবাসস্থল!
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫১

প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতা আল্লাহ্‌র নিয়ামত

প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকারী বাগ্মিতা আল্লাহর নিয়ামত। এ সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ঃ

> তিনি যাকে ইচ্ছে প্রজ্ঞা দান করেন, আর যে প্রজ্ঞা লাভ করে সে তো এক মহান সম্পদে ঋদ্ধ হয়। কিন্তু ধীমান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ মনোযোগ দিয়ে শোনে না।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৯

> আমরা তার রাজ্যকে শক্তিশালী করি এবং তাকে দিই প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকারী বাগ্মিতা।
>
> —সূরা সা'দ ঃ ২০

প্রজ্ঞা ও প্রভাবশালী বাগ্মিতা হচ্ছে বড় নিয়ামত। একই বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্নভাবে বক্তব্য দিতে পারেন। কিন্তু সবচাইতে প্রভাবশালী শৈলী হচ্ছে প্রাজ্ঞ ও সিদ্ধান্তকারী। এই রকম শৈলী শ্রোতাকে মনোযোগী হতে বাধ্য করে, তাকে ভাবায় এবং সম্প্রতি জ্ঞাত সদ্য বিস্মৃত বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করতে প্রণোদিত করে। একজন সিদ্ধান্তকারী দক্ষতাসম্পন্ন বক্তা তাঁর বক্তব্য অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়িত করেন না, বরং সংক্ষিপ্ততম সময়ে ও সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য ভাষায় তাঁর চিন্তা ও মত প্রকাশ করেন। একজন প্রাজ্ঞ বক্তা কোন বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যাদান মাত্র কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ বাক্যের আন্তরিকতাপূর্ণ উচ্চারণের মধ্যে সীমিত রাখেন। ফলে তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের ওপর প্রবল প্রভাব ফেলে। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রবল প্রভাবশালী বাগ্মিতা একটি শিক্ষা-লভ্য দক্ষতা নয়। এর কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বা কলাকৌশল নেই। এই দক্ষতা কেবল আন্তরিকতা ও আল্লাহর নিয়ামতের জন্য প্রার্থনা দাবি করে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকে তার বক্তৃতাকালে এই প্রজ্ঞার বিভূতি দান করেন।

পরম প্রজ্ঞা ও চূড়ান্ত প্রভাবশালী ভাষণের মহাগ্রন্থ অবশ্যই আল্লাহর প্রত্যক্ষ বাণী সম্বলিত আল-কুরআন। মানবজাতির কাছে আল্লাহ্‌র নাযিল করা সকল কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্য এই প্রজ্ঞা। নিম্নোক্ত আয়াতে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে ঃ

> তাদের কাছে বার্তা পৌঁছে গেছে, একটি সরোষ সতর্কবাণী সহ ঃ পরিপূর্ণ করো জ্ঞান— কিন্তু সকল সতর্কবাণী নিষ্ফল হয়েছে।
>
> —সূরা আল-কামার ঃ ৪-৫

মানুষকে তার চিন্তা ও অভিপ্রায় সম্পর্কেও জবাবদিহি হতে হবে

কেবল তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সকল এবাদত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদনের জন্যে আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ঃ

> .... সেটা আরও উত্তম যদি কেউ কিছু সম্পদ দান করতে পারে। তবে রোজা রাখাটাই তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম, তোমরা যদি তা বুঝতে।
>
> —সূরা আল- বাকারা ঃ ১৮৪

> তোমরা তোমাদের সকল নামায, বিশেষ করে মধ্যবর্তীটি, (আদায়ের অভ্যাস) কঠোরভাবে বজায় রাখবে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করবে।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৮

> ইব্রাহিম ছিলেন নিজেই একটি পূর্ণ জনগোষ্ঠির মত, আদর্শস্থানীয়, রবের প্রতি সনিষ্ঠ প্রণত ও বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ঈমানসম্পন্ন ; আল্লাহ্‌র কোন শরীক তিনি মানতেন না।
>
> —সূরা আন-নাহ্‌ল্ ঃ ১২০

কুরআনে আল্লাহ এমনকিছু লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যারা খুব ঘটা করে আল্লাহর এবাদত করে এবং সম্পদ বিলিয়ে দেয় শুধু লোক দেখাবার জন্যে। কিন্তু কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে আমরা অবহিত হই যে, রোজা, নামায, সাদকা ও প্রকাশ্য আনুগত্য প্রদর্শন নয় বরং এসব যে করে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অন্তর্গত ভাবনাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। লোক দেখানো এবাদতকারিগণ আল্লাহ্‌র ধ্যান করে না এবং প্রার্থনাকালে তাদের দুর্বলতা ও আনুগত্যের বিষয়টিও বিবেচনা করে না, তারা এবাদতের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে মাত্র। আবার বাহ্যিকভাবে কাউকে খুব দানশীল মনে

হতে পারে। হয়ত সে একের পর এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ও দরিদ্রদের সাহায্য করে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সে যদি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এসব না করে থাকে এবং অধিকন্তু সে যদি আল্লাহর সম্মুখে দুর্বল ও পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর মুখাপেক্ষী অনুভব না করে এবং যদি তার আখিরাতের ভয় না থাকে তাহলে তার এসব আপাত সৎকাজগুলোর কোনটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, কুরবানীর পশুর রক্ত তাঁর কাছে পৌছে না, পৌঁছে শুধু কুরবানীদাতার তাকওয়া ঃ

> এগুলোর রক্ত বা মাংস তাঁর কাছে পৌছে না, পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর যেভাবে তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছিলেন সেজন্য। পুণ্যবানদের সুসংবাদ দাও।
>
> —সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৩৭

জনসাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে মানুষ শুধু তার কর্মের জন্যই দায়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন যে, কর্ম ছাড়াও মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার অভিপ্রায়, চিন্তা এবং এমনকি তার অন্তরের গভীরে লুক্কায়িত ভাবনার জন্যেও ঃ

> আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক আল্লাহ্। তোমাদের মনের গহনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব চাইবেন। যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপরেই সর্বশক্তিমান।
>
> —সূরা আল- বাকারা ঃ ২৮৪

কার মনে কি আছে আল্লাহ্ তা জানেন। চেতন-অবচেতনের চিন্তাভাবনা অন্য সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা গেলেও আল্লাহর অগোচরে থাকে না। মানুষ ও তার মনের মধ্যখানে অবস্থান নেন আল্লাহ্। তাই মানুষ কিছুই গোপন করতে পারে না আল্লাহর কাছে। তার মনে কি সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়, শয়তান কী

ওয়াসওয়াসা দেয়, মুমিনদের সম্পর্কে সে কী ভাবে, কুরআনে তার আস্থা কতটুকু, এবাদতকালে তার মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এসব কিছুই একে একে আল্লাহর গোচরীভূত হয় এবং এ সবকিছুই ফেরেশতাদের দ্বারা নথিভুক্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেউ যদি জড়িমাগ্রস্তভাবে, দায় সারাভাবে নামায আদায় করে কিংবা তার মনের মধ্যে যদি পরস্পরবিরোধী চিন্তা-ভাবনার উদয় হয় আল্লাহ তা' অনুপুঙ্খ জানতে পারেন। সে এদের প্রত্যেকের মুখোমুখী হবে হাশরের দিন। চিত্তকে শুদ্ধ করে, দ্বীনের নৈতিক আদর্শ অনুসরণে জীবনযাপন করে এবং শুধু শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠান পালন নয় আন্তরিকতাপূর্ণ ও একনিষ্ঠ এবাদত করে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের জন্যে অনন্তজীবনকে উপেক্ষা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার কাজ। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতগুলোতে আল্লাহ মানুষকে ইহজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন ঃ

> হে আমার বান্দাগণ! ইহজীবন শুধুই ক্ষণস্থায়ী উপভোগ। পরকালই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।
>
> —সূরা গাফির ঃ ৩৯

> এ লোকগুলো এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়েছে আর মহাজীবনের ভাবনার প্রতি পিছন ফিরে আছে।
>
> —সূরা আল-ইনসান ঃ ২৭

আল্লাহ্ই মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার সৃষ্টি করেন

বহু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন তিনিই মানুষের হৃদয়ে স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসার সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি মুমিনদের একত্রিত করেন এবং তাদের হৃদয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন ঃ

> তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার বীজ বপন করেন এবং তার অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিলে, তখন তিনি তা থেকে তোমাদের উদ্ধার করেন। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা সঠিকপথে পরিচালিত হতে পার।
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, তিনি মুমিনদের হৃদয়ে কোমলতা ও পবিত্রতা দান করেন ঃ

> .... আমরা তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম বিচারবুদ্ধি এবং আমাদের তরফ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা ; সে ছিল আল্লাহ-ভীরু।
>
> —সূরা মারয়াম ঃ ১২-১৩
>
> যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, সর্ব করুণাময় আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর ভালোবাসা দান করেন।
>
> —সূরা আল-মারয়াম ঃ ৯৬

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাঁদের কাছে শান্তিলাভ করতে পার, এবং তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও সহমর্মিতা।

> নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে ওইসব লোকের জন্যে যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।
>
> —সূরা আর-রূম ঃ ২১

আল্লাহ্ আরো বলেছেন যে, তিনি মুমিনদের ও তাঁদের শত্রুদের মধ্যেও ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের ও অন্য সকলের হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করেন ঃ

> আশা করা যায় যে, তোমাদের ও যারা এখন তোমাদের শত্রু তাদের মধ্যে আল্লাহ ভালোবাসা পুনঃস্থাপন করবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরম ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।
>
> —সূরা আল-মুমতাহীনা ঃ ৭

কাফেরদের মৃত্যু আর মুমিনদের মৃত্যু একরূপ নয়

কুরআনে আল্লাহ্ মৃত্যু সম্পর্কে একটি রহস্য উন্মোচন করেছেন যা বহু লোকের কাছেই অজানা — একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রকৃত অভিজ্ঞতা অন্যেরা বাহ্যিকভাবে যা' দেখে তার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> মৃত্যুর থাবা যখন তার কণ্ঠ দেশে পৌঁছে গেছে এবং তোমরা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছ, তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।
>
> —সূরা আল-ওয়াকিয়া ঃ ৮৩-৮৫

আল্লাহ্র উন্মোচিত আরেকটি রহস্য হচ্ছে মৃত্যুর মুহূর্তে কাফেররা যে ত্রাস ও যন্ত্রণা ভোগ করে সে সম্পর্কিত। মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যাপাশে যারা উপস্থিত তারা এই ত্রাস দেখতে পাবার কথা নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়াতে ঃ

> ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় গুনাহগার আর কে যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে কিংবা দাবি করে, 'আমার কাছে এই ওহি নাযিল হয়েছে' যখন আদপেই তার কাছে কোন কিছুই নাযিল হয়নি অথবা যে ব্যক্তি বলে 'আমিও নাযিল করবো যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন' ? আহা, আপনি দেখতে পেতেন ওই পাপীরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে, "বের কর তোমার প্রাণ। আল্লাহ্র সম্পর্কে অপবাদ প্রচারের এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশের প্রতিদান পাবে আজ ঃ কঠোর, অবমাননাকর শাস্তি।"
>
> —সূরা আনআম ঃ ৯৩

> তাদের বিত্তবেসাত আর সন্তান-সন্ততি দেখে অভিভূত হবেন না। এ সবের মাধ্যমেই আল্লাহ্ চান দুনিয়ায় তাদের শাস্তি দিতে, এবং তারা যেন কাফের থাকা অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করে।
>
> —সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৫

কুরআনে উন্মোচিত রহস্যানুসারে, একজন কাফের তার মৃত্যুশয্যায় শান্তিতে প্রাণত্যাগ করেছে মনে হতে পারে। শয্যাপাশে যারা উপস্থিত তাদের কাছে প্রতীয়মান হতে পারে মরণদশায়, তার আদৌ কোন যন্ত্রণা বা দুর্ভোগ হয়নি, শুধু জীবনাবসানে দু'নয়ন মুদ্রিত হল। কিন্তু আল্লাহ্ জানাচ্ছেন কাফের মরণদশায় নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। ফেরেশতারা কিভাবে কাফেরদের জান কবজ করে তা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ

> যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পশ্চাৎ দেশে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবজ করবে তখন কি অবস্থা হবে ? এ অবস্থা হবে এ কারণে যে, তারা আল্লাহর বিরাগভাজন কাজ করত এবং আল্লাহর পছন্দের কাজ ঘৃণা করত। তাই আল্লাহ তাদের সব কাজ নিষ্ফল করে দেন।
>
> —সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৭-২৮

> আহা, যদি আপনি দেখতে পেতেন ফেরেশতারা কিভাবে কাফেরদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাৎ দেশে আঘাত করতে করতে জান কবজ করে আর তিরস্কার করে ঃ 'দহনজ্বালা কেমন একটু চেখে দেখ! এটা তোমাদেরই কর্মফল। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জুলুম করেন না।'
>
> —সূরা আল-আনফাল ঃ ৫০-৫১

কাফেরদের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর বিপরীতে মুমিনেরা আরামদায়ক মৃত্যুবরণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নবীর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধকালে একজন মুমিন ছুরিকাঘাতে মৃত্যুলগ্নে, সব ধরনের ভীতির উর্ধ্বে উঠে, এক পরম শান্তিময় মৃত্যু মুহূর্তের অভিজ্ঞান লাভ করেন। একটি আয়াতে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন, মুমিনদের আত্মা পবিত্র অবস্থায় গ্রহণ করা হবে, ফেরেশতাগণ তাঁদের অভিবাদন করবেন ও সুসংবাদ দেবেন। মুমিনদের মৃত্যুর বিষয়ে আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন ঃ

> .... ফেরেশতাগণ পুণ্যবান অবস্থায় যাদের জানকবজ করে। তারা বলে, "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। জান্নাতে প্রবেশ কর। এ-পুরস্কার তোমাদেরই কর্মফল"।
>
> —সূরা-আন-নাহল ঃ ৩২

এবাদত মুমিনকে মন্দকাজ থেকে দূরে রাখে

সালাত আল্লাহ্‌র আরাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কুরআনে নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান করা হয়েছে। কঠোরভাবে সালাত কায়েম করার জন্য আল্লাহ্ পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন। যারা এবাদতে নিষ্ঠাবান তাদের জন্য আরেকটি পুরস্কারের কথাও বলা হয়েছে কুরআনে ঃ

> আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা আবৃত্তি করুন এবং সালাত কায়েম করুন। সালাত আপনাকে অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে দূরে রাখবে। আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা আরো ভালো। আল্লাহ্ জানেন আপনি কি করেন।
>
> —সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৪৫

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যারা সালাত কায়েম করে অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে তারা দূরে থাকে। আল্লাহ্‌ই তাদের এই স্খলন পরিহার করার অনুপ্রেরণা দান করেন।

যে ব্যক্তি কুরআনে নির্দেশিতভাবে সালাত কায়েম করে ও নিষ্ঠার সাথে এবাদাত করে সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। দিনে পাঁচবার আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং আনত ও সিজদারত হবার ফলে অবশ্যই সে মন্দকাজ থেকে দূরে থাকবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় তার বিবেক তাকে অশুভ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যদি বা সে কখনো মুহূর্তের ভুলে কোন অন্যায় করে ফেলে তাহলেও সে অচিরেই সে ভুলটা বুঝতে পারবে এবং অসীম শক্তির অধিকারী আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এভাবে সে অনুতাপ করবে এবং ভবিষ্যতে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে।

আল্লাহর পথে নিহতরা মৃত নয়

আল্লাহ্ কুরআনে আরেকটি রহস্য উন্মোচন করেছেন এই মর্মে যে যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে "মৃত" নন, বরং আল্লাহ্র সন্নিকটে জীবিত। বিষয়টি বিবৃত হয়েছে নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে ঃ

> যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত ভেবো না। না, মোটেই তা নয়। তারা তাদের রবের সন্নিকটে জীবিত ও সুসংস্থিত ; আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহে তারা উল্লসিত এবং যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, পেছনে রয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করছে। তাদের কোন ভীতির অনুভূতি নেই, দুঃখবোধ নেই, আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ও নিয়ামতে তারা উৎফুল্ল। আল্লাহ্ মুমিনদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

> যারা আল্লাহর পথে নিহত তাদের মৃত ভেবো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জানো না।
>
> —সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৪

শহীদদের ঐ গন্তব্য নির্দেশনা যে আল্লাহর সম্মুখে পরিপূর্ণ করা হয় এবং তাঁরা যে বেহেশতে স্বাগত হন সেই রহস্যটি উন্মোচিত হয়েছে কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহে ঃ

> .... এবং যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কিছুতেই তাদের কর্মফল নষ্ট হতে দেবেন না। তিনি তাদের পথনির্দেশ করবেন এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করবেন এবং তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে বিষয়ে তিনি তাদের অবহিত করেছেন।
>
> —সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪-৬

> তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাদের রব বললেন, "আমি বিনষ্ট করি না তোমাদের কর্মফল, তোমরা পুরুষ বা নারী যা-ই হও না কেন, এক্ষেত্রে তোমরা পরস্পরের সমান। যারা গৃহ ত্যাগ করেছে বা গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের থেকে তাদের দোষত্রুটিগুলো স্খালন করব এবং আল্লাহর পুরস্কারস্বরূপ তাদের দাখিল করব বেহেশতে, যার তলদেশে প্রবাহিত শীতল বারিধারা। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে।"
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৫

> যারা আল্লাহ্‌র পথে গৃহত্যাগ করে নিহত হয়েছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট জীবিকাদাতা। তিনি এমন মনোরম স্থানে তাদের দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, পরম সহিষ্ণু।
>
> —সূরা-আল-হাজ্জ ঃ ৫৮-৫৯

আল্লাহ্‌র পথে নিহত ব্যক্তিদের বিষয়ে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে কুরআনের কতিপয় রহস্যই উন্মোচন করা হয়েছে যা সর্বসাধারণের গোচরীভূত নয়।

আল্লাহই হচ্ছেন সম্মানদাতা

পরকালে অবিশ্বাসী বহুলোক ইহকালে শক্তি, ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্বেষায় এমনভাবে বিভোর হয়ে পড়ে যেন এই ইহজীবন তাদের সমগ্র জীবন। জীবনভোর তারা লোভাতুর এই অন্বেষায় ব্যাপৃত থাকে। শক্তিশালী, ক্ষমতাবান ও সম্মানিত হবার বিষয়ে তাদের আছে নিজস্ব মূল্যবোধ ও মানদণ্ড। এই মানদণ্ড অনুসারে তাদেরকে বিত্তশালী, সমাজে নেতৃস্থানীয় ও খ্যাতিমান হতে হয়। এর কোন একটিতে ঘাটতি হলেই তারা ভাবে তাদের সব মান-সম্মান ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি ধূলোয় মিশে গেল। কিন্তু তারা ভ্রান্ত। তাদের ভ্রান্তিটি কুরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে ঃ

> তারা তাদের শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হিসেবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের আরাধনা করেছে। কিন্তু না, তা হবে না। তারা তাদের আরাধনা অস্বীকার করে তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।
>
> —সূরা মারয়াম ঃ ৮১-৮২

ক্ষমতা ও বলবত্তার একক মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা ও বলবত্তা দান করেন।

সুতরাং যারা ক্ষমতা ও আধিপত্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা ছাড়া অন্যতর উপায় অবলম্বন করে তারা আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করে, কেননা, ধন, গৌরব বা মর্যাদার দ্বারা কোন ব্যক্তির সাধ্য নেই ক্ষমতায়নের। তাছাড়া, ব্যক্তির ক্ষমতা ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর জন্য মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন শীর্ষ নির্বাহী মুহূর্তে তার সমুদয় ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও সম্মান হারাতে পারে, কেননা, আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সবকিছুর একমাত্র ও প্রকৃত মালিক।

আল্লাহ্ তাঁর সে সব বান্দাকে সম্মানে ও ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেন যারা সর্বান্তকরণে তাঁর আরাধনা করেন এবং কুরআন অনুসরণ করেন। কুরআনের

আদর্শে যিনি জীবনযাপন করেন তিনি কখনো এমন কাজ করতে পারেন না যার পরিণামে আল্লাহ্‌র সম্মুখে তিনি অপদস্থ হতে কিংবা দুঃখিত বা লজ্জিত হতে পারেন। শুদ্ধচিত্ত মুমিনগণ আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে বা কোন শক্তিকে ভয় করেন না এবং কারো অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন না। তাঁরা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করেন এবং শুধু তাঁকেই ভয় করেন। এ কারণেই তাঁদের কোন দুর্বলতা বা অপূর্ণতাবোধ থাকে না। তাঁদের কোন বিত্তবেসাৎ বা পদগৌরব না থাকলেও আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে সম্পদ ও সম্মানে অভিষিক্ত করেন। তাঁরা মুমিন ও কুরআন অনুসারীর মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব লাভ করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

সকল শক্তি আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণের।

—সূরা আল-মুনাফিকুন ঃ ৮

সরল সঠিক পথ সন্ধানের রহস্য

প্রায় সব মানুষেরই জীবনচর্যায় ভালোমন্দ দুটি দিক আছে। ব্যক্তিভেদে এই ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ডে অনেক তফাৎ হয়। একটি বই, একজন মানুষ একজন রাজনীতিক, কিংবা কখনো কখনো একজন দার্শনিক কোন ব্যক্তির জীবনে পথপ্রদর্শক হতে পারে। তবে সঠিক পথ, যে পথ মুক্তির মঞ্জিলে পৌছাতে পারে, সে পথটি হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এই পথের পরম সিদ্ধি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, করুণা ও জান্নাত। অন্যসব পথ আপাত দৃষ্টিতে যত আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, সেগুলো হচ্ছে ছলনাময় এবং তাদের পরিণাম হচ্ছে ধ্বংস, হতাশা, দুঃখ আর ইহকাল-পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই বেদনাময় শাস্তি।

কুরআনে উন্মোচিত একটি রহস্য ঃ যারা সঠিক পথে পরিচালিত তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা যাদের আল্লাহ্‌ই সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং যারা আল্লাহ্‌র বেহেশ্‌ত হাসিল করবেন।

দৃঢ় প্রতীতির সাথে বিশ্বাস

সবার ওপরে, দৃঢ় বিশ্বাস বা ঈমান থাকতে হবে, তবেই সরল সঠিক পথে পরিচালিত হবার আশা করা যাবে। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, স্বর্গ-মর্ত্য ও উভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর মালিক আল্লাহ্‌ এবং তার অস্তিত্বের হেতু হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেবক হওয়া, আর সারাজীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আত্মোৎসর্গ করা তাহলে আল্লাহ্‌ তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্‌, পরকাল ও কুরআনে বিশ্বাস হতে হবে একটি দৃঢ়, সংশয়াতীত ও অবিচলিত বিশ্বাস। কিছু কিছু লোক নিজেদের ঈমানদার বলে দাবি করলেও মনে মনে সংশয় পোষণ করে। যখন তারা কাফেরদের প্রভাব বলয়ে পড়ে তখন তারা ধর্মের নৈতিক আদর্শানুসারে জীবনযাপনে শৈথিল্য দেখায় এবং আল্লাহ্‌ ও দ্বীনের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রদর্শন করে। কিন্তু যাদের আল্লাহ্‌ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন তাঁরা স্থির অচঞ্চল বিশ্বাসে অটল থাকেন ঃ

যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তাদের রবের কাছ থেকে তাদেরকে দেয়া সত্যজ্ঞান, তাদেরকে এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তাদের চিত্ত তাঁর প্রতি আনত রাখতে হবে। যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

—সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫৪

আল্লাহ্‌র কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ

আল্লাহ্‌র কাছে মুমিনদের পূর্ণ আত্মসমর্পণ হচ্ছে সরল পথে পরিচালিত হবার আরেকটি রহস্য। আল্লাহ্‌তে যে ঈমান আনে এবং আখিরাত ভাবনায় যে মোত্তাকী তাকে মোহজালে জড়াতে পারে না পার্থিব জীবন। মুমিনদের যেহেতু একমাত্র উচ্চাকাঙ্খা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান, তাই তাঁরা সকল কর্মে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন এবং আল্লাহ তাঁদের পরীক্ষা করছেন এই সচেতনতা থেকে তাঁরা আল্লাহ্‌র দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আল্লাহ্ আমাদের অবহিত করছেন যে, যারা তাঁর কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তিনি তাঁদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন ঃ

> তোমরা কি করে অবিশ্বাস করতে পার যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ তোমাদের মধ্যে রয়েছেন ? যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে সঠিকপথে পরিচালিত হবে।
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০১

> তিনি নূহকে যে দ্বীন দিয়েছিলেন তোমাদেরকেও সে দ্বীনেরই বিধান দিয়েছেন। আপনার প্রতি ওহি নাযিল করে যে নির্দেশ দিয়েছি, ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে তদনুরূপ নির্দেশ দিয়েই বলেছিলাম, 'তোমরা দ্বীনকে কায়েম কর এবং এর মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি কর না।' আপনি মুশরিকদের যা অনুসরণ করার আহবান জানিয়েছেন তাদের পক্ষে তা বড়ই দুষ্কর। আল্লাহ্ যাদের ইচ্ছা মনোনয়ন করেন এবং যারা তাঁর অভিমুখী হয় তিনি তাদের তাঁর পথে পরিচালিত করেন।
>
> —সূরা আশ-শূরা ঃ ১৩

নির্দেশ পালন

আল্লাহর যেসব বান্দা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হবার অভিলাষী তাদের প্রতি আল্লাহর আরেকটি আদেশ ঃ

> .... যদি তারা তা-ই করতো যা করার জন্য তাদের আহবান জানানো হয়েছিল তাহলে সেটা তাদের জন্যই অতি উত্তম হত এবং সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ হতে তাদেরকে অপরিমেয় পুরস্কার দেয়া হত। আর আমরা অবশ্যই তাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করতাম।
>
> —সূরা আন-নিসা ঃ ৬৬-৬৮

মোত্তাকী মুমিনগণ নিজেদের দোষক্রটি স্খালন করে আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি বিধান-উপযোগী নৈতিক পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হতে সচেষ্ট হন। তবে দোষক্রটির জন্যে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্যে অবশ্য প্রয়োজন বিনয় ও নম্রতা। একজন বিনীত ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্যে সর্বাগ্রে সর্বপ্রযত্নে আদেশ মেনে চলবে। তাছাড়া সৎ মুমিনেরা পরস্পরের মিত্র ও রক্ষক। তাঁরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ান ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করেন। সুতরাং একজন মুমিনের সতর্কবাণীও আখিরাতের তথা শেষ বিচার দিনের হিসাব-নিকাশে অতীব গুরুত্ববাহী হবে একথা বিবেচনায় রেখে মুমিনদের উচিত পরস্পরের আদেশ উপদেশে যথাযথ গুরুত্ব দান করা। সৎ উপদেশ যে গ্রহণ করে সে সৎপথে পরিচালিত হয়। আল্লাহ তাঁর সে সকল বান্দাকে সুসংবাদ দান করেন যারা শয়তানের সংসর্গ পরিহার করেন এবং যারা কুরআন ও তার নির্দেশাবলীর প্রতি আহবান জানান ও যারা নির্দেশ মান্য করেন।

> যারা ভূয়া ভগবানের আরাধনা ত্যাগ করে আল্লাহ্র দিকে পরিচালিত হয় তারা সুসংবাদ পাবে। কাজেই আমার বান্দাদের সুসংবাদ দিন। যারা মনোযোগ দিয়ে বক্তব্য শোনে এবং তারপর তার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তার অনুসরণ করে তারাই সৎপথে পরিচালিত হয়েছে এবং তারাই ধীমান।
>
> —সূরা আয-যুমার ঃ ১৭-১৮

মানুষের অন্তরতম সত্তাই অশুভের আবাহন করে

মানুষের অন্তরতম সত্তাই তার অস্তিত্বের অভ্যন্তরস্থ আজ্ঞাকারী শক্তি এবং এই শক্তি পাপবৃত্তি ও তা পরিহারের পন্থা উভয় বিষয়েই অবহিত। অন্য কথায়, এই অন্তরতম সত্তাই অশুভ ও গর্হিত কার্যকলাপের প্রণোদনা দান করে। অন্তরতম সত্তার এই দুই বৈশিষ্ট্য নিয়েই আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ঃ

> এবং তার অন্তরতম সত্তা ও যা তাকে সুঠাম করেছে ; অশুভ প্রবণতা ও কর্তব্যবোধ, উভয় উপাদানে তাকে পূর্ণ করা হয় ; যে ব্যক্তি একে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে সেই হয়েছে কামিয়াব।
>
> —সূরা আশ-শামস ঃ ৭-৯

মানুষের সকল পাপাচার ও মন্দকাজের উৎস বলে নির্দেশ করা হয়েছে অন্তরতম সত্তাকে। সে কারণে সেই হচ্ছে মানুষের তথা মানব জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু। সে উদ্ধত, স্বার্থপর, রিপুতাড়িত, অহঙ্কারী, কেবল নিজের স্বার্থ উদ্ধারে, কামনা-বাসনা পূরণে ও ভোগবিলাসে মত্ত। বৈধ পন্থায় তার আশা-আকাঙ্খা পূরণ সব সময় সম্ভব নয় বলে সে মানবজাতিকে স্বার্থসিদ্ধিতে যেকোন উপায় অবলম্বনে প্ররোচিত করে। কুরআনে নবী ইউসূফ (আঃ)-এর জবানিতে বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে এভাবে ঃ

> আমি বলছি না যে আমি নিজেও সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ ছিলাম। আমাদের অন্তরতম সত্তা-গহন মন-সকল অপকর্মের হোতা, অবশ্য তাদের নয়, যাদের ওপর আমার রবের করুণা বর্ষিত হয়েছে। আমার রব পরম ক্ষমাশীল, করুণাময়।
>
> —সূরা ইউসূফ ঃ ৫৩

মানুষের অন্তরতম সত্তা বা মানুষের অন্তর্গত গহন মন যে মানুষকে পাপাচার ও গর্হিত কর্মে প্রবল প্ররোচনা দেয় এটি আল্লাহ-ভীরু মুমিনদের কাছে উন্মোচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। এই রহস্যভেদ থেকেই তাঁরা জানতে পারেন যে, গহন মনের প্ররোচনা ও ফন্দিফিকির অহর্নিশি চলতেই

থাকে, মুহূর্তের জন্যেও তার বিরাম নেই। তার সার্বক্ষণিক প্রয়াস মানুষকে লোভ দেখিয়ে প্ররোচিত করে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করা। তাঁরা আরো জানতে পারেন গহন মন কখনো নীরব থাকবে না, সদাসচেষ্ট থাকবে সর্বাবস্থায় তার সকল কাজের সাফাই দিতে, সবার চাইতে বেশি ভালোবাসবে নিজেকে, উদ্ধত হবে, ভালো সবকিছুই চাইবে নিজের দখলে নিতে এবং সর্বোপরি চাইবে বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবনযাপন করতে। সংক্ষেপে, সে যেকোন উপায় অবলম্বন করবে মানুষকে এমন মনোভাব গ্রহণ করতে যা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান উপযোগী নৈতিকতার পরিপন্থী।

বস্তুতঃ কুরআনের নৈতিকতার বিরোধী মনোভাবাপন্ন কাফেরদের আচরণ সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হয় তাদের গহন মনের দ্বারা। আল্লাহ-ভীরু নয় বলে কাফেররা তাদের বিবেকের নির্দেশ পালন করার ইচ্ছাশক্তি পোষণ করতে পারে না ; বরং তারা তাদের রিপুতাড়িত গহন মনের অনুসরণ করে। দ্বীনের নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজগুলোতে সমাজের ব্যক্তি মানুষেরা স্বার্থচিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে প্রেম, শ্রদ্ধা ও ত্যাগের মানবিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলে ; ফলে সেসব সমাজে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অশান্তি ও বিবাদ লেগেই থাকে।

তাই আল্লাহর উন্মোচিত এ রহস্য এতো গুরুত্বপূর্ণ। এই রহস্যের কথা স্মরণে রাখলে গহন মনের বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করে সঠিক আচরণবিধি অনুসরণ করা যায়।

গহন মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে যা চায় তার বিপরীত কর্ম করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গহন মন যদি আলস্যে এলিয়ে পড়তে বলে তো আরও বেশি কঠোর শ্রমের কাজে শশব্যস্ত হওয়া উচিত। সে যদি স্বার্থপর হতে বলে তো আরও বেশি ত্যাগী হতে হবে এবং সে কঞ্জুস হতে বলে তো হতে হবে দরাজহস্ত।

আমরা সূরা আশ্-শামস থেকে জানতে পারি, আত্মার এ মন্দ দিকটি ছাড়াও আল্লাহ্ আত্মার মধ্যে বিশেষ বিবেক সঞ্চারিত করেছেন যা আত্মাকে হীন বাসনা চরিতার্থ করার কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য মানুষকে প্রেরণা দেয়। মানুষের মাঝে, আত্মার অন্যায় কাজে প্ররোচনা দেবার শক্তির পাশাপাশি ন্যায় কাজে প্রেরণা দেবার শক্তিও রয়েছে।

প্রত্যেক মানুষই মনের গহনে এই দুই শক্তির বাদানুবাদ শুনতে পায় এবং ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায়কে স্বতন্ত্রভাবে সনাক্ত করতে পারে, কিন্তু কেবল মুত্তাকীরাই তাঁদের বিবেকের নির্দেশনা মান্য করেন।

মানুষকে দেয়া সম্পদ ও প্রাচুর্যের রহস্য

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক আল্লাহ, তিনি যাকে ইচ্ছা যা খুশি তাই দান করেন। আল্লাহই মানুষের জীবিকার সংস্থান করেন, মানুষকে বিত্তশালী করেন ও তাকে পর্যাপ্ত ফসল দান করেন। কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক বাড়িয়ে দেন, আবার বিপরীতক্রমে যাকে ইচ্ছা তার সংস্থান কমিয়ে দেন। তিনি তা করেন কোন নিশ্চিত কারণে এবং প্রজ্ঞার সাথে। বস্তুত যার সংস্থান বাড়ানো হল আর যার কমানো হল, উভয়কেই আল্লাহ পরীক্ষা করছেন। যারা পেয়েছে তাদের মধ্যে যারা উদ্ধত হয়নি কিংবা বিগড়ে যায়নি বরং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং যারা পায়নি তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপরে বিশ্বাসে অটল থাকেন তারাই হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা, যাদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। কুরআনের আয়াতে নবী সুলাইমান (আঃ)-এর জবানীতে বলা হয়েছে যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত কার্যত ওই পরীক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ ঃ

> কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি বলল, 'আমি তা আপনাকে এনে দেখাব, আপনার চোখের পলক পড়ার আগেই।' অতঃপর সুলাইমান (আঃ) যখন তা দেখলেন তখন তিনি বললেন ঃ 'এ আমার রবেরই নিয়ামত আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না কৃতঘ্নতা। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারই লাভ হয় তাতে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার জানা উচিত) নিশ্চয়ই আমার রব অভাবমুক্ত ধনী ও পরম বদান্য।'
>
> —সূরা আন-নাম্‌ল্‌ ঃ ৪০

'এ আমার রবেরই নিয়ামত আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না কৃতঘ্নতা'—কুরআনে উল্লিখিত নবী সুলাইমান (আঃ)-এর এই উক্তি থেকে মানুষকে নিয়ামত প্রদানের একটি কারণের ব্যাখ্যা পাই।

আল্লাহ্ কুরআনে 'পার্থিব জীবনের আকর্ষণগুলো' বলে যার উল্লেখ করেছেন যথা ঃ সম্পদ, সন্তান, জায়া বা পতি, আত্মীয়-স্বজন, মর্যাদা, মান, ধীশক্তি, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য, লাভজনক বাণিজ্য, সাফল্য, তথা সকল নিয়ামতেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরীক্ষা করা।

কাফেরদের সম্পন্নতার রহস্য

পৃথিবীতে এমন বহু লোক আছে আল্লাহর অস্তিত্বে যাদের বিশ্বাস নেই অথচ তারাই দীর্ঘ জীবন উপভোগ করছে, প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েছে, উর্বর জমির মালিক হয়েছে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করছে। এসব লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার পরিবর্তে এসব আশীর্বাদের কারণেই অধঃপতিত হয়েছে এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছে। তারা খোদাদ্রোহী জীবনযাপন করে দিনানুদিন তাদের পাপের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে কিন্তু তারা মনে করে তাদের ওইসব প্রাপ্তিই তাদের জীবনের পরম চরিতার্থতা। তবে, তাদের এসব প্রাপ্তি ও সুসময় সম্পর্কিত আরেকটি রহস্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কুরআন ঃ

> তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি দেখে চমৎকৃত হবেন না। আল্লাহ চান শুধু এদের মাধ্যমেই তাদেরকে এ দুনিয়ায় শাস্তি দিতে এবং তাদের যেন মৃত্যু হয় কাফের অবস্থায়।
>
> —সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৫

> কাফেররা যেন এমন ধারণা পোষণ না করে যে, আমরা তাদের যে বাড়তি সময় দিয়েছি তাতে তাদের কোন মঙ্গল হবে। বাড়তি সময়টা দিয়েছি যাতে তাদের পাপের বোঝাটা আরও ভারি হয়ে ওঠে। তাদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭৮

> সুতরাং তাদের কিছুদিন থাকতে দিন তাদের মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে। তারা কি ভাবছে আমরা ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-

> সন্ততি দিয়ে তাদের জন্য সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি ? না, মোটেই তা নয়। কিন্তু তারা জানে না।
>
> —সূরা আল-মুমিনুন ঃ ৫৪ - ৫৬

এই আয়াতগুলোতেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাদের যত কিছু সহায়-সম্পদ তা মোটেই তাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়। যে সময় তাদের দেয়া হয়েছে তা শুধু তাদের পাপের বোঝা বাড়াবার জন্য। সময় যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততি কিংবা তাদের মান-মর্যাদা কেহই, কিছুই, অতি বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে না। অতীত প্রজন্মগুলোতেও যেসব লোক সম্পদ ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েও পরিশেষে যন্ত্রণাময় শাস্তি পেয়েছে তাদের বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

> বিষয়-আশয়ে জাঁকজমকে তাদের চাইতে অনেক বড় অতীতের কত জনগোষ্ঠীকে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।
>
> —সূরা মার্‌য়াম ঃ ৭৪

এদের কেন বাড়তি সময় দেয়া হয় সে কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই আয়াতে ঃ

> আপনি বলে দিন ঃ যারা বিপথে আছ—পরম করুণাময় আল্লাহ তাদের সময় দিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে সে বিষয়ে, তা শাস্তিই হোক কিংবা কেয়ামত। তারপর তারা বুঝতে পারবে, কে নিকৃষ্টতর অবস্থানে রয়েছে এবং কার দলবল দুর্বলতর।—সূরা মার্‌য়াম ঃ ৭৫

আল্লাহ ন্যায়বিচারক ও পরম করুণাময়। তিনি সবকিছুই প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের সঙ্গে সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেককে তার কর্মের যোগ্য প্রতিফল দেন। এ বিষয়ে অবহিত বলেই মুমিনগণ আল্লাহর সকল সৃষ্টিতে প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখার চেষ্টা করেন। অন্যথায় মানুষ বাস্তবতাবিবর্জিত প্রবঞ্চনার জীবনযাপনে অধঃপতিত হতো।

কাফেরদের তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর শাস্তি প্রদান না করার রহস্য

কুরআনে উন্মোচিত অন্যতম রহস্য হচ্ছে এই যে, মানুষকে তার পাপাচারের জন্য তৎক্ষণাৎ শাস্তি না দিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা মুলতবি রাখা হয়। নিম্নের দু'টি আয়াতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

> আল্লাহ যদি মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য (সঙ্গে সঙ্গে) দণ্ডদান করতেন তাহলে ধরাতলে একটি প্রাণীও বিচরণ করতে পারত না। কিন্তু তিনি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেহাই দেন। তারপর সময় যখন ফুরিয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখবেন!
>
> —সূরা ফাতির ঃ ৪৫

> আপনার রব সদা-ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। তিনি যদি তাদের পাপাচারের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইতেন তাহলে অবিলম্বে তাদের শাস্তি দান করতেন। কিন্তু তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময় রয়েছে যা থেকে তারা লুকোবার পথ পাবে না।
>
> —সূরা আল-কাহফ্ ঃ ৫৮

পাপাচারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি না পেয়ে অনেকে ভাবে কুকর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি হতে হবে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অনুশোচনা, ক্ষমা প্রার্থনা ও ভুল সংশোধন থেকে বিরত থাকে। এতে করে তাদের স্পর্ধা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে পরকালে তাদের শাস্তি যে আরও বেশি অসহনীয় হয়ে উঠবে সেটা বোঝার মত দূরদৃষ্টি তাদের থাকে না। কুরআনে আল্লাহর সতর্কবানী রয়েছে ঃ

> কাফেরদের এ রকম ধারণা করা উচিত হবে না যে, তাদের যে বাড়তি সময় দিচ্ছি তা তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। তাদের

> আরও সময় দিচ্ছি শুধু তাদের পাপের বোঝা বাড়িয়ে তুলবার জন্য। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।
>
> —সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭৮

এই যে বাড়তি সময় আল্লাহ মঞ্জুর করছেন এটা শুধু মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে। তবে আল্লাহর দৃষ্টিতে অবশ্যাই একটা কাল পরিধি আছ যার অন্তিমলগ্নে বিহিত ব্যবস্থা করা হবে। সেই কাল পরিধিরি অন্তিম লগ্ন যখন সমুপস্থিত তখন তাকে মুহূর্তের জন্যেও বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত করা যাবে না। আল্লাহ বলছেন ঃ প্রত্যেকেই তার যথোপযুক্ত প্রতিদান পাবে ঃ

> যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে পূর্বেই একটি ফরমান জারি ও একটি সময় নির্ধারিত না থাকত তাহলে ইতিমধ্যেই তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকত।
>
> —সূরা ত্বাহা ঃ ১২৯

> আমি তাদের আরও সময় দেব। আমার দৃঢ় কৌশল নিশ্চিত।
>
> —সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৮৩

উপসংহার

যদি কেউ আন্তরিক সদুদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন পাঠ করে এবং কুরআনের বাণী তার অন্তরাত্মায় গ্রথিত হতে দেয়, যদি সে একজন বিশ্বাসী মানুষের চোখ দিয়ে তার চারপাশের জীবন, ঘটনাবলী ও লোকজনকে অবলোকন করে এবং যদি সে আল্লাহকে তার একমাত্র বান্ধবরূপে বরণ করে তাহলে সে কুরআনে উন্মোচিত রহস্যগুলো স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবে। ছোট-বড় কোন ঘটনাই এলোপাথাড়ি ঘটে না। দুর্ঘটনা বা সমাপতন বলে কিছু নেই। প্রতিটি ঘটনার পেছনেই থাকে একটি রহস্য, একটি শুভ ঐশী অভিপ্রায়। মানুষ যদি সনিষ্ঠ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে এবং সর্বদা খোদাপরস্ত হয় তাহলেই সে এইসব রহস্য অনুধাবন করতে ও তাদের পাশ্চাতে প্রাজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে।

কুরআনের রহস্যগুলো যিনি অনুধাবন করতে পারেন তিনি আল্লাহর আরও অধিক সান্নিধ্যে পৌছাতে পারেন এবং আল্লাহর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তিনি আল্লাহকে, স্বর্গমর্ত্যের স্রষ্টাকে এবং তাঁর শক্তি, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আরও ভাল বুঝতে পারেন। তিনি জানেন আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন বন্ধু নেই এবং রক্ষক নেই। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সৃষ্ট জ্ঞান ও রহস্য দর্শন ও অনুধাবনের আনন্দ-উল্লাসে তাঁরা উদ্বেলিত হন। এই ধরনের ব্যক্তিদের কাছে আল্লাহ্ অধিকতর রহস্য উন্মোচন করেন। তাঁদের জীবন নিতান্তই সাধারণ মনে হলে কার্যত আল্লাহ্ প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের জন্যে অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করেন। যে কেউ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য বুঝতে চান আল্লাহ তাঁকে তা বোঝার তৌফিক দান করবেন।

এ-কথা বলা হয়েছে কুরআনের একটি আয়াতে ঃ

> যারা আমার এবাদত করে তাদের জন্য নিশ্চয়ই একটি সরল বাণী রয়েছে এতে (কুরআনে)।
>
> —সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০৬

বিবর্তনের ভ্রান্ত দর্শন

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল তথ্যই একটি উচ্চতর সৃষ্টি শক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে, জড়বাদ বা বস্তুবাদ, যা বিশ্বে সৃষ্টিতত্ত্বকে অস্বীকার করে, একটি ভ্রমাত্মক মতবাদ বই কিছু নয়।

বস্তুবাদ বাতিল হলে সেই দর্শনের ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান অন্যান্য মতবাদও বাতিল হয়ে যায়। এই অন্য মতবাদগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে ডারউইনিজম তথা বিবর্তনবাদ। বিবর্তনতত্ত্ব দাবি করে যে, প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে নিষ্প্রাণ জড়বস্তু থেকে আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। এই তত্ত্ব ধূলিস্মাৎ করা হয়েছে বিশ্বসৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এই সত্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে। মার্কিন জ্যোতিঃ পদার্থবিদ হিউ রস এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

নাস্তিক্যবাদ বা এ্যাথেইজম্, ডারউইনিজম্ তথা অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর দর্শনসমূহ থেকে উদ্ভূত সকল ইজম্-এর ভিত্তি হচ্ছে এই ধারণা, এই ভ্রান্ত ধারণা, যে মহাবিশ্ব অনন্ত, অসীম। কিন্তু এ ভ্রান্তির বিনাশী প্রতীতি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় বিশ্ব ও জীবন সহ যা কিছু সে ধারণ করে আছে তার পশ্চাতে/ ঊর্ধে/ সম্মুখে/ যে কারণ বা কারক রয়েছে তার মুখোমুখী।৯

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয় যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এর ক্ষুদ্রতম অংশসহ সবকিছুর রূপকার। কাজেই বিবর্তনবাদের এই তত্ত্ব সত্য হওয়া অসম্ভব যে, জীবন্ত সত্তাসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি নয়, তারা শুধু ঘটনাপুঞ্জের যোগাযোগের ফসল।

এতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে বিবর্তনবাদের দিকে যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি, দেখতে পাই যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী এই তত্ত্বকে ধিক্কার দিচ্ছে। জীবনের রূপ নিরতিশয় জটিল ও চমকপ্রদ। জড় জগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কি সংবেদনশীল ভারসাম্যের ওপর বস্তুনিচয়ের পরমাণুসমূহ সংস্থিত। আবার জীবজগতের দিকে তাকালে ভেবে অবাক হতে হয় কি জটিল নক্সার ভিত্তিতে এসব পরমাণুর সমাহার ঘটেছে এবং তাদের

সহযোগে কি অসাধারণ বস্তুসমূহ যথা প্রোটিন, এনজাইম ও কোষ গঠন করা হয়েছে।

প্রাণের এ অসাধারণ রূপবিন্যাস বিশ শতকের শেষপর্যায়ে ডারউইনিজম-এর কবর রচনা করে।

আমরা এ বিষয়ে আমাদের অপর কয়েকটি গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছি, আর এ আলোচনা আমরা অবিরাম চালিয়ে যাব। সে যা-ই হোক, প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা মনে করি এখানেও বিষয়টির একটা সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা সমীচীন হবে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ডারউইনিজম পরাজিত

সেই সুদূর অতীতের গ্রীসেও একটি ধারণা হিসেবে প্রচলিত থাকলেও বিবর্তনবাদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে উনিশ শতকে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটি বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞানের জগতে শীর্ষ প্রসঙ্গ করে তোলে তা হচ্ছে ১৮৫৯ সালে চার্লস্ ডারউন রচিত একটি পুস্তকের প্রকাশ, যার নাম 'প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি (The origin of species)। এই বইতে ডারউইন অস্বীকার করেন যে, পৃথিবীতে বিরাজমান বিভিন্ন জীবন্ত প্রজাতি আল্লাহ পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন। ডারউইনের মতে, সকল প্রাণীরই আদি উৎস এক ও অভিন্ন ছিল, সময়ের পরিধিতে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে।

ডারউইনের তত্ত্বটি কোন বাস্তব বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, এটি একটি "ধারণা" মাত্র। অধিকন্তু এই বইয়ের "তত্ত্বটির কতিপয় সমস্যা" (Difficulties of the theory) শীর্ষক দীর্ঘ একটি অধ্যায়ে তিনি স্বীকার করেছেন যে, বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিতে তত্ত্বটি অপারগ।

ডারউইন তাঁর সকল আশা ন্যস্ত করেছিলেন বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কারে, যেগুলো "তত্ত্বটির কতিপয় সমস্যা" সমাধানের উপায় উপহার দেবে। কিন্তু তাঁর কপাল দোষে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ওই সমস্যাগুলোর মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় শুধু।

বিজ্ঞানের হাতে ডারউইনিজমের পরাজয়ের বিষয়টি তিনটি মূল প্রসঙ্গের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে ঃ

১। পৃথিবীতে প্রাণের অভ্যুদয় কিভাবে হল তা এই তত্ত্ব কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে না।

২। এই তত্ত্বে প্রস্তাবিত 'বিবর্তনী প্রক্রিয়াগুলো'র বিবর্তন করার কোন ক্ষমতা আদৌ আছে কিনা তা প্রতিপাদন করার যোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত নেই।

৩। জীবাশ্মের ইতিহাস বিবর্তনতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা সপ্রমাণ করে।

এ অনুচ্ছেদে আমরা এ তিনটি মূল প্রসঙ্গ সাধারণভাবে আলোচনা করব।

প্রথম অনতিক্রম্য বাধা

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব দাবি করে যে, আদিম পৃথিবীর বুকে ৩৮০ কোটি বছর আগে একটিমাত্র জীবিত কোষের উদ্ভব হয় এবং সেটি থেকেই সকল প্রাণধারী প্রজাতির অভ্যুদয় ঘটে। একটি মাত্র কোষ কি করে লক্ষ লক্ষ জটিল জীবন্ত প্রজাতির জন্ম দিতে পারে এবং সত্যি যদি এরকম কোন বিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে জীবাশ্মের ইতিহাসে এর কোন চিহ্নমাত্র কেন পাওয়া যাচ্ছে না এ রকম বহু প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ এ তত্ত্ব। তবে, অনুমিত বিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ সম্পর্কে, প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এই "প্রথম কোষ"-এর উৎপত্তি কিভাবে হল ?

বিবর্তনতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব কোন প্রকার আধিভৌতিক শক্তি অস্বীকার করে বিধায় দাবি করে যে, "প্রথম কোষ"-টি প্রকৃতির নিয়মাবলীর মধ্যেই যোগাযোগের কারণে উদ্ভূত হয়, এর পেছনে কোন নক্সা, বিন্যাস বা পরিকল্পনা ছিল না। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মিশ্রণের কারণে জড় বা অজৈব বস্তু থেকে জৈব কোষের উদ্ভব ঘটে। জীববিদ্যার অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলীর সঙ্গে এ দাবি অসঙ্গতিপূর্ণ।

প্রাণের উৎস প্রাণ

ডারউইন তাঁর বইতে কোথাও প্রাণের উৎপত্তির বিষয়ে কিছু বলেননি। তাঁর সমকালে বিজ্ঞানের আদিম ব্যুৎপত্তি এ ধারণার বশবর্তী ছিল যে সকল প্রাণীই সরল শরীর সংস্থান বিশিষ্ট। বিভিন্ন জড়বস্তুর সংশ্লেষণে প্রাণের উৎপত্তি হয়। এ অজীবজনি তত্ত্বটি মধ্যযুগ থেকেই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ছিল। সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, পোকা-মাকড়ের জন্ম হয় খাদ্যের উচ্ছিষ্ট থেকে এবং ইঁদুরের জন্ম হয় গম থেকে। এ তত্ত্ব প্রমাণের জন্য অনেক কৌতুককর পরীক্ষা চালানো হয়। এক টুকরো নোংরা কাপড়ের ওপর কিছু গম রেখে দিয়ে ভাবা হত খানিক পরেই ওখান থেকে ইঁদুর লাফিয়ে ছুটবে।

অনুরূপে, মাংসে উৎপন্ন কীট মনে করা হত অজীবজনি-তত্ত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ। কিন্তু অল্পকাল পরেই জানা যায় ওই কীট মাংসে স্বতঃজনিত হয়ে আবির্ভূত হয়নি, বরং মাছিরা তাকে ওখানে বয়ে নিয়ে গেছে লার্ভা আকারে, খোলা চোখে যা দেখা যায়নি।

এমনকি ডারউইনের ওই বই লেখার সময়েও বিজ্ঞানের জগতে রোগজীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) অজীবজনি এ বিশ্বাসটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ছিল।

ডারউইনের বইটি প্রকাশের পাঁচ বছর পর লুই পাস্তুর তাঁর বহু বছরব্যাপী দীর্ঘ গবেষণার ফল প্রকাশ করেন যা ডারউইনের তত্ত্বের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ বিবেচিত অজীবজনি তত্ত্ব অপ্রমাণিত করে। ১৮৬৪ সালে সরবোন-এ তাঁর বিজয়োল্লসিত ভাষণে পাস্তুর বলেন, "এ সরল গবেষণা যে মরণাঘাত হেনেছে তা সয়ে আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না অজীবজনি তত্ত্ব।"[১০]

বিবর্তনবাদের প্রবক্তারা বহুদিন পাস্তুরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রাণীদেহের কোষের যে জটিল গঠন উদঘাটিত করে তা', প্রাণ যে নিছক সংমিশ্রণ থেকে উত্থিত হতে পারে—এ ধারণাকে আরও কঠিন সঙ্কটে ফেলেছে।

বিশ শতকের নিষ্ফল প্রয়াস

প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে বিংশ শতাব্দীতে প্রথম যে বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত রুশ প্রাণীবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার

ওপারিন। ১৯৩০-এর দশকে প্রণীত বিভিন্ন তাত্ত্বিক অভিসন্দর্ভে তিনি সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, জড়জগতের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার আকস্মিক যোগাযোগ থেকে জীবকোষের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু তাঁর সব গবেষণার ব্যর্থতা ছিল অবধারিত। ওপারিনকে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হয় ঃ

> দুর্ভাগ্যক্রমে, জীবকোষের উৎপত্তির সমস্যাটিই হচ্ছে জৈব বিবর্তনের অন্বেষায় সবচাইতে অস্পষ্ট বিষয়।[১১]

ওপারিনের বিবর্তনবাদী অনুসারীরা প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যাটি সমাধানের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। সর্বাপেক্ষা সুবিদিত পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন মার্কিন রসায়নবিদ স্ট্যানলী মিলার, ১৯৫৩ সালে। আদিম পৃথিবীর আবহাওয়ামন্ডলে যেসব গ্যাস বিরাজমান ছিল বলে তিনি দাবি করেন, একটি পরীক্ষায় সেসব গ্যাস সম্মিলিত করে তিনি সেই মিশ্রণের সঙ্গে শক্তি (এনার্জি) যুক্ত করেন, তারপর তার সঙ্গে সংশ্লেষিত করেন বিভিন্ন প্রোটিনের সংযুক্তিতে বিদ্যমান কতিপয় জৈব অণু (এ্যামাইনো এসিডস্)।

মাত্র কয়েক বছর পার হতে না হতেই স্পষ্ট বোঝা যায় বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে উপস্থাপিত এই পরীক্ষা অসিদ্ধ। কারণ এতে ব্যবহৃত আবহাওয়ামন্ডল ছিল পৃথিবীর বাস্তব পার্থিব পরিপার্শ্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।[১২]

দীর্ঘ নীরবতার পর মিলার স্বীকার করেন যে, তিনি যে আবহাওয়া মাধ্যম ব্যবহার করেন তা ছিল অবাস্তব।[১৩]

বিংশ শতাব্দীতে প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্যে সকল বিবর্তনবাদী প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। স্যান ডিয়েগো স্ক্রিপ্স্ ইন্সটিট্যুটের ভূ-রসায়নবিদ জেফ্রি বাডা এটা স্বীকার করেছেন ১৯৯৮ সালে 'আর্থ' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ঃ

> আজ এই বিংশ শতাব্দীর বিদায় লগ্নে আমরা এখনো সেই বৃহত্তম অমীমাংসিত সমস্যাটির সম্মুখীন হয়ে আছি যার সম্মুখীন আমরা হয়েছিলাম বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ঃ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল ?[১৪]

প্রাণের জটিল অবকাঠামো

বিবর্তনবাদের এমন বৃহৎ অচলায়তনে অবসিত হবার প্রাথমিক কারণ হলো এই যে, এমনকি সরলতম বলে বিবেচিত জীবের মধ্যেও রয়েছে অবিশ্বাস্য রকমের জটিল অবাকাঠামো। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, একটি জীবকোষ মানুষের সকল প্রযুক্তিগত উৎপন্নের চাইতে জটিল। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নত গবেষণাগারেও অজৈব বস্তুর সমাহার ও সংশ্লেষে একটি জীবকোষ উৎপাদন করা যাবে না।

একটি জীবকোষ গঠনের জন্য অনুকূল ও সহযোগী অবস্থা, পরিবেশ ও অনুষঙ্গের সংখ্যা এত বিপুল যে শুধু সংমিশ্রণের তত্ত্ব দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

কোষ গঠনের মূল উপাদান প্রোটিনের সমাপতনিকভাবে সংশ্লেষিত হবার সম্ভাবনা ৫০০ এ্যামোইনো এসিডযুক্ত সাধারণ প্রোটিনের ক্ষেত্রে $১০^{৯৫০}$-এ ১ গণিতশাস্ত্রে $১০^{৫০}$-এ ১ অপেক্ষা কম সম্ভাবনা (probability)-কে কার্যত অসম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়।

কোষের পরমাণু কেন্দ্রে অবস্থিত ডিএনএ অণু হচ্ছে বংশানুগতি তথ্যের ভান্ডার এবং এটি একটি অবিশ্বাস্য ডাটা ব্যাংক। হিসেব কষে দেখা গেছে ডিএনএ-তে কোড করা তথ্য যদি কাগজে-কলমে লেখা হয়, তাহলে তা' দিয়ে প্রতিটি ৫০০ পৃষ্ঠা সংবলিত ৯০০ খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়ার এক বিশাল গ্রন্থাগার গড়া যাবে।

এই পর্যায়ে একটি চিত্তাকর্ষক ধাঁধার উদ্ভব ঘটে ঃ ডিএনএর পুনর্সৃষ্টি হতে পারে কেবল কতিপয় বিশেষায়িত প্রোটিন (এনজাইম)-এর সহযোগে। কিন্তু এনজাইমগুলোর সংশ্লেষণ সম্ভব কেবল ডিএনএ-তে কোড করা তথ্য দ্বারা। যেহেতু তারা উভয়ে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং পুনর্সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় উভয়কে একই সময়ে বিদ্যমান থাকতে হবে। প্রাণ আপনা-আপনিই উদ্ভূত হয়েছে এই তত্ত্বটি এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট বিবর্তনতাত্ত্বিক অধ্যাপক লেসলি ওর্গেল তাঁর তত্ত্বের এই বিপর্যয় স্বীকার করেছেন ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' ম্যাগাজিনে ঃ

> প্রোটিন ও নিউক্লেয়িক এসিড উভয়ের গঠনপ্রণালী অতি জটিল। এটা প্রায় অসম্ভব যে, উভয়ে একই স্থানে ও একই কালে স্বতঃ উদ্ভূত হয়েছিল। আবার, একটি ছাড়া অন্যটির অবস্থানও অসম্ভব মনে হয়। কাজেই প্রাথমিক বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কস্মিনকালেও জীবনের উৎপত্তি হতে পারে না।[১৫]

জীবন যদি প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্ভূত না হয়ে থাকে তাহলে, সন্দেহ কি, জীবন 'সৃষ্টি' করা হয়েছে অতিপ্রাকৃত উপায়ে। এই সত্য সুস্পষ্টরূপে বাতিল করে দেয় বিবর্তন তত্ত্বকে, যার মূল উদ্দেশ্য সৃষ্টিতত্ত্ব অস্বীকার করা।

বিবর্তনবাদের কাল্পনিক যন্তর-মন্তর

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ডারউইনের তত্ত্বকে নস্যাৎ করে তা হচ্ছে এই যে, "বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়া" বলে এই তত্ত্বে উপস্থাপিত উভয় ধারণাই বাস্তবে বিবর্তনী ক্ষমতাহীন বলে অনুভূত হয়।

ডারউইন তাঁর তথাকথিত বিবর্তন তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে "প্রাকৃতিক নির্বাচন" (ন্যাচারাল সিলেকশন) প্রক্রিয়ার ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। এ প্রক্রিয়ার ওপর তিনি কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা তাঁর বইয়ের শিরোনাম থেকেই অনুমান করা যায় ঃ The Origin of Species, By Means of Natural Selection (প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে) . . .

'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ধারণামতে কেবল সেসব প্রাণীই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে যারা অধিকতর শক্তিশালী এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বন্যজন্তুর আক্রমণের হুমকির মুখে একটি হরিণের পালের মধ্যে যে হরিণগুলো দ্রুততর গতিতে দৌড়াতে পারবে সেগুলোই বেঁচে থাকবে। সুতরাং হরিণের পাল গড়ে উঠবে দ্রুততর ও বলবত্তর হরিণদের নিয়ে। তবে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই যে, এই প্রক্রিয়া হরিণদের বিবর্তিত করে অন্য কোন প্রজাতি, যথা ঃ ঘোটক-এ রূপান্তরিত করবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার কোন বিবর্তনবাদী ক্ষমতা নেই। ডারউইনও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং তাঁর বই "প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি"-তে তাঁকে বলতে হয়েছে ঃ

> ঘটনাক্রমে অনুকূল বৈচিত্র্যের উদ্ভব না ঘটা পর্যন্ত প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছুই করার থাকে না।[১৬]

লামার্কের প্রভাব

তাহলে এ "অনুকূল বৈচিত্র্য" বা পরিবর্তনগুলো কিভাবে ঘটতে পারে? ডারউইন তাঁর সমকালের বিজ্ঞানের আদিম ধারণা থেকে এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। ডারউইনের পূর্বসূরী ফরাসী জীববিজ্ঞানী লামার্ক বলেন যে, প্রাণীকূলের জীবনব্যাপী অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো উত্তর প্রজন্মে বর্তায়; এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে সংবহিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সমাহারের ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল। লামার্ক এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ দাবি করেন যে, হরিণের বিবর্তনে জিরাফের উদ্ভব হয়। হরিণদের উঁচু ডালের পাতা খাবার নিরন্তর চেষ্টার ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্মে তাদের গলা লম্বা হতে থাকে, পরিশেষে তাদের বিবর্তিত উত্তর প্রজন্ম জিরাফ আকারে নতুন প্রজাতিরূপে উদ্ভূত হয়।

ডারউইনও অনুরূপ কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন; যেমন, The Origin of Species গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে কিছু ভল্লুক খাদ্যের সন্ধানে জলে নেমে তিমি হয়ে যায় কালান্তরে।[১৭]

কিন্তু মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত উত্তরাধিকারবিধি, যা বিংশ শতাব্দীতে বিকশিত প্রজননবিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত, পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেয় এ বিশ্বাস যে প্রাণীকূলের অর্জিত বৈশিষ্ট্য উত্তর প্রজন্মে বর্তায়। এভাবেই একটি বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ারূপে প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্বটি অনাদৃত হয়ে পড়ে।

নয়া ডারউইনবাদ ও পরিব্যক্তি

এ সমস্যার একটি সমাধানে পৌঁছার আশায় ডারউইনবাদীরা ১৯৩০ দশকের শেষ দিকে উত্থাপন করেন, "আধুনিক সংশ্লেষী তত্ত্ব" (Modern Synthetic Theory) যা, নিও-ডারউইনিজম্ নামে সমধিক পরিচিত। নিও-ডারউইনিজম "অনুকূল বৈচিত্র্যের কারণ" স্বরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের অতিরিক্ত প্রাণীদেহে জীনের (gene) পরিব্যক্তি (mutation) ধারণার

আমদানি করে ; বাহ্যিক কারণ যথা বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয়তা কিংবা পুনরুৎপাদন ভ্রমের ফলে জীনের এরূপ বিকৃতি ঘটে বলে তাঁদের ধারণা।

আজ সমগ্র বিশ্বে বিবর্তনবাদের যে আদর্শ বা মডেল টিকে আছে তা হচ্ছে, নিও-ডারউইনিজম্। এই তত্ত্ব মতে পৃথিবীতে যে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির প্রাণী বিদ্যমান রয়েছে তাদের আবির্ভাব ঘটেছে এমন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাতে তাদের জটিল অঙ্গ সংস্থানগুলো যথা ঃ চোখ, কান, ফুসফুস, ডানা — প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে জীনঘটিত বিকৃতির ফলে পরিব্যক্তি লাভ করে। কিন্তু এ তত্ত্বটি নস্যাৎ করছে একটি সোজা সাপটা বৈজ্ঞানিক সত্য ঃ পরিব্যক্তি প্রাণীদের বিকশিত করে না, বরং তাদের ক্ষতি করে।

এর কারণ অতি সহজবোধ্য ; ডিএনএ-এর আছে অতি জটিল সংযুতি (Structure), এলোপাতাড়ি বিন্যাসভঙ্গ কেবল তার ক্ষতিই করতে পারে। মার্কিন প্রজনন বিজ্ঞানী বি. জি. রঙ্গনাথন-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

প্রথমত, প্রকৃতিতে প্রকৃত পরিব্যক্তি খুবই বিরল। দ্বিতীয়ত, পরিব্যক্তি যেহেতু জীনের সংযুতির সুশৃঙ্খল পরিবর্তন নয় বরং এলোপাতাড়ি, সেহেতু বেশির ভাগ পরিব্যক্তিই ক্ষতিকর। অতি সুশৃঙ্খল একটি সংযুতিতে এলোপাতাড়ি পরিব্যক্তির ফল মন্দই হবে, ভালো হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ভূমিকম্প যদি অতি সুশৃঙ্খল একটি সংযুতি, যথা দালান, কাঁপিয়ে দেয় তাহলে তার ফলে ওই সংযুতির কাঠামোতে যে পরিবর্তন সংঘটিত হবে তা, খুব সম্ভব, কাঠামোর উন্নতিসূচক হবে না।[১৮]

বিস্ময়কর নয় যে, কোন উপকারী অর্থাৎ যা জীন কোড উন্নত করে, এমন পরিব্যক্তি আজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। সব পরিব্যক্তিই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে, "বিবর্তন প্রক্রিয়া" বলে যে পরিব্যক্তি হাজির করা হয়েছে তা আসলে জীন অভ্যন্তরের এমন একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনা যা প্রাণীসত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এবং তাকে অক্ষম বা বিকলাঙ্গ করে। (মানুষের ক্ষেত্রে পরিব্যক্তির সবচাইতে সাধারণ পরিণাম হচ্ছে কর্কটরোগ বা ক্যানসার)। নিঃসন্দেহে একটি বিধ্বংসী প্রক্রিয়াকে "বিবর্তন প্রক্রিয়া" বলা যায় না। অপরপক্ষে, "প্রাকৃতিক নির্বাচন এককভাবে কিছুই করতে পারে না", স্বয়ং ডারউইন এ-কথা স্বীকার করেছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রকৃতিতে "বিবর্তন প্রক্রিয়া" বলে কিছু নেই। যেহেতু বিবর্তন প্রক্রিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই সুতরাং বিবর্তন নামে কোন কাল্পনিক ঘটনাও কদাপি সংঘটিত হয়নি।

জীবাশ্মের ইতিহাস

মধ্যবর্তী আকার বা রূপের কোন প্রমাণ নেই

বিবর্তনতত্ত্বে যেসব ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা যে কখনো ঘটেনি তার সুস্পষ্টতম সাক্ষী হচ্ছে জীবাশ্মের ইতিহাস (Fossil Record)।

বিবর্তনতত্ত্বানুসারে প্রতিটি প্রাণধারী প্রজাতি একটি পূর্বগামী প্রজাতি থেকে উদ্ভূত। একটি পূর্বতন প্রজাতি ক্রমাগত পরিব্যক্ত হয়ে কয়েক প্রজন্মান্তরে একটি ভিন্ন প্রজাতিরূপে আবির্ভূত হয়। বিদ্যমান সকল প্রজাতির উদ্ভবই ঘটেছে এভাবে। এই রূপান্তর তথা বিবর্তন, ওই তত্ত্বানুসারে ক্রমাগত নিষ্পন্ন হয়েছে নিযুত বর্ষজুড়ে।

তাই যদি হতো তাহলে এই দীর্ঘ দীর্ঘ রূপান্তরণ পর্বে বহু সংখ্যক মধ্যবর্তী প্রজাতির উদ্ভব ও অস্তিত্ব থাকতো।

যেমন ধরুন বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কোন এক পর্যায়ে কিছু মাছ তাদের মাৎস্য বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত কিছু সরীসৃপ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতো, ফলে সে পর্যায়ে কিছু অর্ধ-মৎস্য-অর্ধ-সরীসৃপ চরাচরে ঘুরে বেড়াতো। অথবা কিছু সরীসৃপ তাদের সারীসৃপ্যের অতিরিক্ত খানিক পক্ষিত্ব অর্জন করে সরীসৃপ-পক্ষীতে পরিণত হতো। যেহেতু এসব প্রজাতির অবস্থা হতো পরিবৃত্তিকালীন বা অর্ধ বিবর্তিত, এগুলো হতো ত্রুটিপূর্ণ, অশক্ত ও বিকলাঙ্গ। বিবর্তনবাদীরা অতীতে এ ধরনের কাল্পনিক প্রাণীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তারা এদের নাম দিয়েছে "পরিবৃত্তিকালীন জীব"।

এমন জন্তু সত্যি যদি থাকতো তাহলে তাদের সংখ্যা ও প্রজাতি বৈচিত্র হতো লক্ষ লক্ষ, এমন কি কোটি কোটি। তার চাইতে অধিক প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এসব আজব প্রাণীর দেহাবশেষ জীবাশ্মের ইতিহাস (Fossil record)-এ থাকতো। The Origin of Species-এ ডারউইনের ব্যাখ্যা ঃ

> আমার তত্ত্ব সত্য হলে, একই গ্রুপের প্রজাতিগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সৃষ্টিকারী অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল . . . . . সুতরাং তাদের সাবেকী অস্তিত্বের প্রমাণ কেবল জীবাশ্মের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে।[১৯]

ডারউইনের আশাভঙ্গ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বিবর্তনবাদীরা সারাবিশ্বে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে অনুরূপ জীবাশ্ম আবিষ্কারের জন্যে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন পরিবৃত্তিকালীন (transitional) প্রজাতির হদিস মেলেনি। বিবর্তনবাদীদের আশার বিপরীতে আজ পর্যন্ত যত জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব অকস্মাৎ ও পূর্ণগঠিতরূপেই ঘটেছিল।

প্রখ্যাত বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ ডেরেক ভি. এইগার, স্বয়ং একজন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই সত্য স্বীকার করেন ঃ

> যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, আমরা জীবাশ্মের ইতিহাস সানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলে, জাতি কিংবা প্রজাতি যে পর্যায়েই হোক বারংবার আমরা দেখতে পাই—ক্রমাগত বিবর্তন নয়, বরং একটি গ্রুপের বিলুপ্তির পর আরেকটির আকস্মিক বিস্ফোরণ।[২০]

তার মানে জীবাশ্মের ইতিহাসে কোন পূর্ববর্তী-মধ্যবর্তী পরিব্যক্তি ব্যতীতই প্রতিটি প্রজাতি পূর্ণগঠিতরূপে আবির্ভূত হয়েছে। ডারউইনের ধারণার বিপ্রতীপ এটি। অধিকন্তু, এতে জোরালোভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণীরা সৃষ্ট হয়। একটি প্রজাতি কোন পূর্বগামী প্রজাতির সংশ্রব ব্যতীত অকস্মাৎ এবং পূর্ণরূপে গঠিত অবস্থায় আবির্ভূত হবার অর্থ হচ্ছে প্রজাতিটি ওভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। বিবর্তনবাদী বলে সুবিদিত জীববিজ্ঞানী ডগলাস ফুটুয়ামা এই সত্যটি স্বীকার করে নিচ্ছেন এভাবে ঃ

> সৃষ্টি ও বিবর্তন, এ-দুয়ের মধ্যেই সকল জীবিত বস্তুর উৎপত্তির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা শেষ। জীবিত সত্তা পৃথিবীতে পূর্ণগঠিতরূপে

> আবির্ভূত হয়েছে কিংবা তা হয়নি। যদি না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে পূর্বগামী প্রজাতি থেকে কোন প্রকার অভিযোজন বা রূপান্তরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। আর যদি সে পূর্ণগঠিতরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কোন সর্বজ্ঞ ধীশক্তি তাকে সৃষ্টি করেছে।[২১]

জীবাশ্ম সপ্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে পূর্ণগঠিত ও নিখুঁত অবস্থায়। তার মানে "প্রজাতিসমূহের উৎপত্তি"-র আদি কারণ ডারউইন কথিত বিবর্তন নয়, সৃষ্টি।

মানব বিবর্তনের অলীক বাহিনী

বিবর্তনতত্ত্বের প্রবক্তারা যে বিষয়টি প্রায়শ ঃ উত্থাপন করে থাকেন তা হচ্ছে মানুষের উৎপত্তির উৎস সন্ধান। ডারউইনবাদীরা দাবি করেন ঃ আজকের আধুনিক মানুষের উৎপত্তি হয়েছে এক প্রকারের লাঙ্গুলহীন বানর সদৃশ প্রাণীর বিবর্তন থেকে। ৪০-৫০ লক্ষ বছর আগে প্রারব্ধ এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আধুনিক মানুষ ও তার আদি পূর্বগামী প্রজাতির মধ্যবর্তী সময়ে নর-বানরের কয়েকটি "পরিবৃত্তিকালীন রূপ" ছিল। পুরোপুরি মনগড়া এই দৃশ্যপটে চারটি মূল " শ্রেণী" তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ঃ

১। অস্ট্রেইলো পিথিকাস (Australopithecus)
২। হোমো হেবিলিস (Homo habilis)
৩। হোমো ইরেকটাস (Homo erectus)
৪। হোমো সেইপিয়েন্স (Home Sapiens)

বিবর্তনবাদীরা মানুষের তথাকথিত প্রথম বানর-সদৃশ পূর্ব-পুরুষদের নাম দিয়েছেন, "অস্ট্রেইলোপিথিকাস," যার মানে "দক্ষিণ আফ্রিকার বানর"। আসলে এরা বর্তমানে বিলুপ্ত প্রাচীন একটি বানর প্রজাতি বই কিছু নয়। অস্ট্রেইলোপিথিকাস বানরের বিভিন্ন নমুনার উপর ইংল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন বিশ্ববিশ্রুত শারীরস্থানবিৎ, লর্ড সলি যাকারম্যান ও প্রফেসর চার্লস্ অক্সনার্ড-এর

ব্যাপক গবেষণাকর্মের ফলে দেখা গেছে, এগুলো ছিল বিলুপ্ত একটি সাধারণ বানর প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, মানুষের সঙ্গে এদের কোন সাদৃশ্য নেই।[২২]

বিবর্তনবাদীরা মানব বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপকে অভিহিত করছেন, "হোমো" (homo) অর্থাৎ "মানব"রূপে। তাঁদের দাবি, হোমো পর্যায়ের প্রাণীরা অস্ট্রেইলোপিথিকাস থেকে অধিক বিকশিত, উন্নততর। বিবর্তনবাদীরা এই শ্রেণীর বিভিন্ন জীবাশ্ম একটি বিশেষ ক্রম অনুসারে বিন্যাস করে বিবর্তনের একটা কাল্পনিক ছক তৈরি করেন। এই ছকটি কাল্পনিক কেননা এটা কখনো প্রমাণিত হয়নি যে বক্ষ্যমান শ্রেণীগুলোর মধ্যে কোনরূপ পারস্পরিক বিবর্তনিক সম্পর্ক রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম পুরুধা বিবর্তনবাদী এর্নস্ট মাই (Earnst Mayr) তাঁর রচিত One Long Argument গ্রন্থে বলেন—

> " . . . বিশেষতঃ প্রাণের কিংবা হোমো সেইপিয়েন্স-এর মতো ঐতিহাসিক (ধাঁধাঁগুলো) খুবই কঠিন এবং তারা হয়ত একটি সন্তোষজনক চূড়ান্ত ব্যাখ্যাও প্রতিহত করবে।[২৩]

"অস্ট্রেইলোপিথিকাস > হোমো হেবিলিস > হোমো ইরেক্টাস > হোমো সেইপিয়েন্স"—এই সংযোগ-শৃঙ্খল ছক দিয়ে বিবর্তনবাদীরা বোঝাতে চান যে, এই প্রজাতিগুলোর প্রত্যেকে একে অপরের পূর্বপুরুষ। কিন্তু প্রত্নুবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক বিভিন্ন আবিষ্কারে জানা যায় যে, অস্ট্রেইলোপিথিকাস, হোমো হেবিলিস ও হোমো ইরেক্টাস একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল।[২৪]

অধিকন্তু, হোমো ইরেক্টাস শ্রেণীভুক্ত মানবগোষ্ঠীর একটি অংশ অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। হোমো সেইপিয়েন্স নিয়ান-ডারথালেনসিস ও হোমো সেইপিয়েন্স (আধুনিক মানুষ) যুগপৎ বিদ্যমান ছিল একই অঞ্চলে।

এই পরিস্থিতিতে এসব প্রজাতি একে অপরের পূর্বপুরুষ ছিল এ দাবি ধোপে টেকে না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী স্টিফেন জে গৌল্ড স্বয়ং বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও বিবর্তন তত্ত্বের অচলাবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : এই তিনটি মানব প্রতীম বংশধারা (এ. আফ্রিকানাস, নাদুস-নুদুস

অস্ট্রেইলোপিথিসিস্ ও এইচ. হেবিলিস), যারা পরিষ্কারভাবে একে অপর থেকে উদ্ভূত নয়, তারা যদি সহাবস্থানকারী অর্থাৎ একই সময়ে বিদ্যমান হয় তাহলে বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণাটির স্থান কি হবে ? শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বুকে তারা যখন বিরাজমান ছিল তাদের মধ্যে কোন বিবর্তন প্রবণতা ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না।[২৬]

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রচার মাধ্যমে ও পাঠ্যপুস্তকে কয়েক প্রকারের অর্ধ-নর-বানরের চিত্র এঁকে, অর্থাৎ প্রচারণার জোরে, মানব বিবর্তনের যে দৃশ্যপট তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তা বস্তুতঃ কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া একটি কল্পকাহিনী মাত্র।

যুক্তরাজ্যের অন্যতম পুরুধা ও সম্মানিত বিজ্ঞানী লর্ড সলি যাকারস্যান, যিনি এ বিষয়ে বহু বছর যাবত গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং বিশেষ করে অস্ট্রেইলোপিথিকাস জীবাশ্ম নিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, তিনি স্বয়ং বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেন ঃ বস্তুতঃ এমন কোন বংশলতিকা নেই যেখানে বানর-প্রতীম জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে নরের অভ্যুদয় ঘটেছে।

যাকারম্যান একটি "বিজ্ঞান বর্ণালী" কল্পনা করেছেন। যে সব বিজ্ঞানকে তিনি বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন সেগুলো থেকে যেগুলোকে তিনি অবৈজ্ঞানিক জ্ঞান করেন সেগুলো পর্যন্ত তাঁর এই বর্ণালী বিস্তৃত। যাকারম্যানের মতে, বিজ্ঞানে বাস্তব তথ্যক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক "বৈজ্ঞানিক" বিজ্ঞান হচ্ছে রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যা। তাদের নিকট প্রতিবেশী হচ্ছে জীববিজ্ঞানসমূহ, তারপর সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ। বর্ণালীর শেষ প্রান্তে আসে সর্বাধিক "অবৈজ্ঞানিক" বিজ্ঞানসমূহ, যথা ঃ "অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি-সঞ্জাত ধারণাবলি, যথা ঃ টেলিপ্যাথি ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং পরিশেষে "মানব বিবর্তন।" যাকারম্যানের জবানীতেই শুনুন ঃ

> এর পরেই আমরা বস্তুনিষ্ঠ সত্যের ক্ষেত্র থেকে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি কিংবা মানুষের জীবাশ্ম ইতিহাসের ন্যায় অনুমিত জীববিজ্ঞানের ভূমিতে গিয়ে পড়ি যেখানে বিশ্বাসী (বিবর্তনবাদী)-দের জন্য

> সবকিছুই সম্ভব এবং যেখানে (বিবর্তনবাদে) বিশ্বাসীদের জন্যে কোন কোন সময় একই সঙ্গে কয়েকটি পরস্পরবিরোধী বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনে কোন অসুবিধা হয় না।[২৭]

মানববিবর্তনের গরম খবরটি ঠান্ডা মাথায় বিচার করলে দেখা যাবে এটি আর কিছু নয় শুধু কয়েকজন অন্ধবিশ্বাসী বিবর্তনবাদীর আবিষ্কৃত কতিপয় জীবাশ্মের উদ্দেশ্যমূলক ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা।

চক্ষু-কর্ণের অপরূপ প্রযুক্তি

আরেকটি বিষয় যা সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না তা হচ্ছে, চোখ ও কানের উপলব্ধির চমৎকার গুণ। চোখের বিষয় বিবেচনার আগে "কিভাবে আমরা দেখতে পাই" সংক্ষেপে সে প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব। কোন বস্তু থেকে বিকীরিত আলোর রশ্মি অক্ষিপটে (রেটিনায়) উল্টোভাবে পতিত হয়। আলোক রশ্মিগুলো কোষসমূহ দ্বারা বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত হয়ে মস্তিষ্কের পেছন দিকে ঈক্ষণ কেন্দ্রে (centre of vision) পৌঁছে। বৈদ্যুতিক সঙ্কেতগুলো কয়েকটি প্রক্রিয়া-অন্তে ঈক্ষণ কেন্দ্রে একটি ছবির আকারে প্রতিভাত হয়। এই প্রযুক্তির পটভূমিতে, আসুন কিছু চিন্তা-ভাবনা করি।

মস্তিষ্ক আলোক-প্রতিরোধী, মস্তিষ্কের ভেতরটা ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন, মস্তিষ্ক যেখানে অবস্থিত আলো সেখানে পৌঁছে না। ঈক্ষণ কেন্দ্র বলে অভিহিত স্থানটি হচ্ছে নিরেট অন্ধকার একটি স্থান, আলো যেখানে পৌঁছে না কখনো, হয়তো আপনার জ্ঞাত অন্ধকারতম স্থান এটি। কিন্তু তবু এই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যেই আপনি দেখতে পান দ্যুতিময় উজ্জ্বল বিশ্বের প্রতিবিম্ব।

চোখে যে ছবি ফুটে ওঠে তা এতো তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট যে বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিও তা অর্জন করতে পারেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি যে বইটি পড়ছেন এবং যে দুই হাত দিয়ে তা ধরে আছেন সেদিকে তাকিয়ে দেখুন। তারপর মাথা তুলে চার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আপনি এমন তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট ছবি—আর কোথাও কখনও দেখেছেন কি? এমন কি বিশ্বের বৃহত্তম টেলিভিশন নির্মাতার

উদ্ভাবিত সর্বাপেক্ষা উন্নত টেলিভিশন পর্দাও আপনাকে এমন একটি তীক্ষ্ণ ছবির যোগান দিতে পারবে না। এটি একটি ত্রিমাত্রিক, বহুবর্ণিল ও অতি তীক্ষ্ণ ছবি। শতাধিক বর্ষ ধরে শত সহস্র প্রকৌশলী এই তীক্ষ্ণতা অর্জনের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যে বিশাল বিশাল কারখানা স্থাপন করা হয়েছে, বহু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, পরিকল্পনা ও নক্সা নির্মাণ করা হয়েছে। এবার টেলিভিশনের পর্দার দিকে এবং আপনার হাতে ধরা বইটির দিকে তাকান, দেখতে পাবেন দুয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতার দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। অধিকন্তু টেলিভিশন পর্দা আপনাকে একটি দ্বিমাত্রিক চিত্র দেখাচ্ছে, কিন্তু আপনি আপনার চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন গভীরতাসম্পন্ন ত্রিমাত্রিক চিত্র।

বহু বছর ধরে হাজার হাজার প্রকৌশলী চেষ্টা করছেন একটি ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন তৈরি করতে এবং চোখের দৃষ্টির গুণ ও মানে পৌঁছুতে। হ্যাঁ, তাঁরা একটি ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন পদ্ধতি নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু চশমা না পরে এটি দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই ত্রিমাত্রিক দৃশ্যপট কৃত্রিম, পশ্চাৎপট অপেক্ষাকৃত আবছা আর সম্মুখপট মনে হয় কাগজ-সাঁটা। চোখের দৃষ্টির মতো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ দৃশ্য নির্মাণ করা কখনো সম্ভব হয়নি। ক্যামেরা ও টেলিভিশন উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিচ্ছবির মানের অবনতি ঘটে।

বিবর্তনবাদীরা দাবি করেন যে, যে প্রক্রিয়ায় এই তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট চিত্র প্রতিভাত হয় তা দৈবক্রমে (by chance) নিষ্পন্ন। এখন কেউ যদি আপনাকে বলে আপনার কক্ষে অবস্থিত টেলিভিশন সেটটি কেউ নির্মাণ করেনি, এটি দৈবক্রমে গড়ে উঠেছে, দৈবক্রমে এক জায়গায় এর সকল পরমাণুর সন্নিপাত ঘটেছে এবং তাতে এই প্রতিচ্ছবি প্রদর্শনকারী যন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে, তাহলে, বলুন ঃ আপনার কেমন লাগবে ? হাজার হাজার মানুষ যা করতে পারে না পরমাণুরা তা পারল কীভাবে ?

চোখের চাইতে আদিমতর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টিকারী একটি যন্ত্র যদি দৈবক্রমে গড়ে উঠতে না পারে তাহলে এটা একেবারেই পরিষ্কার যে, চোখ ও চোখে বিম্বিত চিত্র দৈবক্রমে গড়ে উঠতে পারে না। কানের ব্যাপারেও একই কথা। বহিঃকর্ণ শব্দ গ্রহণ করে তা মধ্যকর্ণে প্রেরণ করে, মধ্যকর্ণ শব্দের স্পন্দন

তীব্র করে তা প্রেরণ করে অন্তঃকর্ণে, অন্তঃকর্ণ শব্দের স্পন্দনকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। চোখের দর্শনকর্ম যেমন তেমনি কানের শ্রবণ কর্ম সম্পূর্ণ হয় মস্তিষ্কে, শ্রবণ কেন্দ্রে।

মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্রের পরিস্থিতি ঈক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ, অর্থাৎ মস্তিষ্ক যেমন আলোক- প্রতিরোধী, তেমনি শব্দ-প্রতিরোধী। কোন শব্দই মস্তিষ্কে ঢুকতে পারে না। সুতরাং বাইরে যত কোলাহলই হোক না কেন, মস্তিষ্কের ভেতরটা সম্পূর্ণ নীরব, নিঃশব্দ। তথাপি তীব্রতম শব্দগুলো মস্তিষ্কে অনুভূত হয়। আপনার ওই শব্দ-প্রতিরোধী মস্তিষ্কেই আপনি অর্কেস্ট্রার সিম্ফনিগুলো শুনতে পান এবং জনাকীর্ণ স্থানে সব কলরবও শুনতে পান। কিন্তু সেই মুহূর্তে যদি একটি নিখুঁত যন্ত্র দিয়ে আপনার মস্তিষ্কের শব্দের স্তর মাপা হয়, দেখা যাবে সেখানে সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ বিরাজ করছে।

ছবি বা প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রে যেমন, শব্দের ক্ষেত্রেও তেমনি মূলের অনুরূপ শব্দ উৎপাদনের জন্য বহু যুগ ধরে চেষ্টা চালানো হয়েছে। তারই ফলে উদ্ভাবিত হয়েছে সাউন্ড রেকর্ডার, হাই ফাইডেলিটি সিস্টেম্স্ ও সাউন্ড সেন্সিং সিস্টেম্স্। এতসব প্রযুক্তি ও আয়োজন এবং শত সহস্র প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কান দ্বারা অনুভূত শব্দের তীব্রতা ও স্পষ্টতার সমতুল্য কোন শব্দ অদ্যাবধি উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি। বৃহত্তম সঙ্গীত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত উচ্চতম মানের হাই-ফাই সিস্টেমের কথা ভাবুন। এমনকি এসব যন্ত্রেও যখন শব্দ রেকর্ড করা হয়, তখন তার কিছুটা হারিয়ে যায়, আবার শোনার জন্যে যন্ত্র চালিয়ে দেবার পর দেখবেন সঙ্গীত শুরু হবার আগে একটা হিসহিস শব্দ শোনা যাবে। কিন্তু মানবদেহের প্রযুক্তিতে যেসব শব্দ শ্রুতিগোচর হয় তা অতি স্পষ্ট ও তীব্র। মানুষের কান কখনো হাই-ফাই যন্ত্রের মতো হিসহিসানির সঙ্গে শব্দ শোনে না, শোনে শুধু বিশুদ্ধ শব্দটাই, স্পষ্ট ও তীব্র। তাই হয়ে আসছে মানুষের সৃষ্টির লগ্ন থেকে। আজ পর্যন্ত এমন কোন দর্শন-শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি যা সংবেদ্য উপাত্ত অনুধাবনে চোখ ও কানের তুল্য সংবেদনশীল ও সফল।

সে যাই হোক, দর্শন ও শ্রবণের ক্ষেত্রে, এ-সব কিছুর উর্ধ্বে রয়েছে এক বৃহত্তর সত্য।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কে দেখে ও শোনে যে চেতনা সৃষ্টি করে

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কে মোহময় বিশ্বের অভিরাম দৃশ্যাবলী দেখছে, সঙ্গীতের মূর্ছনা আর পাখির কূজন শুনছে এবং নাসারন্ধ্রে উপভোগ করছে গোলাপের সৌরভ !

মানব দেহের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা থেকে উদ্ভূত প্রেরণাগুলো মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছে তড়িৎ-রাসায়নিক স্নায়বিক স্পন্দনরূপে। মস্তিষ্কে কীভাবে এই প্রতিবিম্ব গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে জীববিজ্ঞান, শরীরবৃত্ত বিজ্ঞান ও প্রাণ রসায়ন গ্রন্থাদিতে বিশদ বিবরণ দেখতে পাবেন। ওসব বিবরণে সবই আছে, নেই শুধু এ বিষয়ে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেশটি ঃ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে এসব ছবি, শব্দ, গন্ধ ও ইন্দ্রিয়বেদ্য ঘটনাবলীর মতো তড়িৎ-রাসায়নিক স্নায়বিক প্রেরণা সঞ্জাত বস্তুনিচয় দেখছে, শুনছে, বুঝছে, উপলব্ধি করছে যে, সে কে ? মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে একটি চেতনা (বা সচেতনতা) আছে যা এ সবকিছুই উপলব্ধি করতে পারে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার কোন প্রয়োজনবোধ না করেই। এই সচেতনতা, কার সচেতনতা ? কোন সন্দেহ নেই, এই সচেতনতার অধীশ্বর নয় মস্তিষ্ক গঠনকারী স্নায়ুতন্ত্র, পরিবেষ্টক স্থূল স্তর ও নিউরণপুঞ্জ। এ কারণেই এসব প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ ডারউইনবাদী-বস্তুবাদীরা, কারণ তাদের বিশ্বাস সবকিছুই গঠিত হয় জড়বস্তু দ্বারা।

এই সচেতনতা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্ট আত্মা। আত্মার প্রয়োজন হয় না প্রতিবিম্ব দেখার জন্য চোখ কিংবা শব্দ শোনার জন্যে কান। এমনকি, চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্কেরও প্রয়োজন হয় না তার।

এই সুস্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক সত্যটি যাঁরা অনুধাবন করতে পারেন তাঁদের সকলের উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ধ্যান করা, তাঁকে ভয় করা ও তাঁর শরণার্থী হওয়া ; তাঁরই অসীম কুদরতে মাত্র কয়েক ঘন সেন্টিমিটার আয়তন-বিশিষ্ট ঘোর তমসাবৃত স্থানে গোটা বিশ্বকে আঁটিয়ে দেন তিনি ত্রিমাসিক, ছায়াময়, বর্ণিল ও দ্যুতিময়রূপে।

একটি জড়বাদী বিশ্বাস

আমরা এ পর্যন্ত যে তথ্য উপস্থাপিত করেছি তাতে দেখা যায় যে, বিবর্তনতত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে এই তত্ত্বের দাবি বিজ্ঞানের বিরোধী, এই তত্ত্বে প্রস্তাবিত বিবর্তন প্রক্রিয়াগুলির কোন বিবর্তন শক্তি নেই, আর জীবাশ্মের ইতিহাস প্রতিপাদন করে যে এই তত্ত্বের দাবিকৃত মধ্যবর্তী রূপগুলোর কখনো কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিবর্তনতত্ত্ব একটি অবৈজ্ঞানিক ধারণারূপে বাতিলযোগ্য। এভাবেই ইতিহাসে অনেক ধারণা যথা ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের কথা বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় তালিকা থেকে বাতিল করা হয়েছে।

কিন্তু বিবর্তনতত্ত্বটি এখনো জোর করে বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় তালিকাভুক্ত রাখা হয়েছে। কিছু লোক এই তত্ত্বের সমালোচনাকে " বিজ্ঞানের ওপর আঘাত" বলে চিত্রিত করছে। কেন ?

কারণ আর কিছুই নয়, বিবর্তনতত্ত্বটি হচ্ছে কতিপয় চক্রের অপরিহার্য অন্ধ বিশ্বাস। এই চক্রগুলো জড়বাদী দর্শনের অন্ধভক্ত এবং ডারউইনিজমের ধারক ও বাহক, কেননা এটাই হচ্ছে একমাত্র জড়বাদী দর্শন যা প্রকৃতির ক্রিয়াকান্ড সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারে।

কৌতুককর ব্যাপার হচ্ছে যে, তারা নিজেরাও মাঝে-মধ্যে এ-কথা স্বীকার করে। প্রখ্যাত জননতত্ত্ববিদ ও স্পষ্টভাষী বিবর্তনবাদী, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড সি. লিওনটিস নিজেকে "প্রথমে ও সর্বাত্মকভাবে একজন বস্তুবাদী ও তারপর একজন বিজ্ঞানী" বলে ঘোষণা করে বলেন ঃ

> এমন নয় যে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো কোন প্রকারে আমাদেরকে চাক্ষুষ বস্তু জগতের একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে বাধ্য করে ; পরন্তু বস্তুবাদী কার্যকারণসূত্রের প্রতি আমাদের অপ্রমাণিত ধারণা প্রসূত অসামঞ্জস্য হেতু আমরা অনুসন্ধানের এমন একটি ছক নির্মাণে ও কতিপয় অনুষঙ্গী ধারণা গ্রহণে বাধ্য হই, তা সে যত স্বজ্ঞাবিরোধীই হোক কিংবা বিজ্ঞজনের কাছে যত

> রহস্যজনক বলেই মনে হোক। অধিকন্তু, যেহেতু বস্তুবাদ পরম, অবিকল্প, সেহেতু আমরা এর চৌকাঠে কোন ঐশ্বরিক পদচারণা অনুমোদন করতে পারি না।[৯]

এইসব বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে ডারউইনিজম হচ্ছে এমন একটি গোঁড়া মতবাদ যা' শুধু বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি আনুগত্যের কারণেই জীইয়ে রাখা হয়েছে। এই মতবাদ দাবি করে যে বস্তু ব্যতীত অপর কোন সত্তা নেই, অজান্তব অচেতন বস্তুই জীবন সৃষ্টি করেছে। পাখি, মাছ, জিরাফ, বাঘ, কীট, গাছ, ফুল, তিমি, মানুষ ইত্যাকার লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ও প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে বস্তুনিচয়ের মিথস্ক্রিয়ার ফলে, যথা ঃ বৃষ্টিপাত, অশনি বিদ্যুচ্চমক, নিষ্প্রাণ পদার্থপুঞ্জের আকস্মিক সমাপতন। এইসব ধারণা যুক্তি ও বিজ্ঞান উভয়েরই পরিপন্থী। তবু ডারউইনবাদীরা এখনো এসব ধারণাই আঁকড়ে ধরে আছে শুধু " চৌকাঠে কোন ঐশ্বরিক পদচারণা অনুমোদন করতে" না পারার জন্যে।

যে-কেউ বস্তুবাদী সংস্কার বর্জন করে প্রাণের উৎপত্তির বিষয়ে চিন্তা করলেই এই স্পষ্ট সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন ঃ সকল সপ্রাণ সত্তাই হচ্ছে এক মহান স্রষ্টার সৃষ্টি, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও পরম প্রাজ্ঞ। এই মহান স্রষ্টাই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, একে নির্মাণ করেছেন নিখুঁততম রূপে এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন সকল প্রাণবান সত্তায়।

বিবর্তনতত্ত্ব বিশ্বের প্রবলতম কুহক

একথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা উচিত যে কোন ব্যক্তি যদি সংস্কারমুক্ত হয়, কোন বিশেষ আদর্শিক মতবাদের অনুসারী না হয়, শুধু নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগ করে তাহলে তার পক্ষে কোনরূপ বিজ্ঞান কৃষ্টি বা সভ্যতাবিবর্জিত জনগোষ্ঠীগুলোর অন্ধবিশ্বাসজনিত কুসংস্কারের সমতুল্য বিবর্তনবাদী মতাদর্শ গ্রহণ অসম্ভব।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি বিবর্তনতত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন বিরাট এক চৌবাচ্চার ভেতর কিছু অণু-পরমাণু ছুঁড়ে ফেললে তা থেকেই জন্ম নেবে চিন্তাশীল বুদ্ধিমান তর্কপটু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র, আইনস্টাইন ও গালিলিও-র মত বিজ্ঞানী, হামফ্রে বোগার্ট, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা ও পাভারোত্তি-র মত শিল্পী এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে হরিন, লেবু গাছ ও কার্নেশন্ ফুল। অপিচ যে অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীকুল এই গাঁজাখুরী তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাঁরা সবাই শিক্ষিত লোক। কাজেই "বিবর্তনতত্ত্ব ইতিহাসের প্রবলতম কুহক" বলা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। পূর্বে কখনও আর কোন বিশ্বাস বা ধারণা এমনভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি হরণ করেনি, মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা রুদ্ধ করেনি এবং এরূপ চোখ-বেঁধে-অন্ধ করা মানুষের কাছ থেকে সত্যকে লুকোয়নি। মিশরীয়দের সূর্য দেবতা রা-এর অর্চনা, আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে টোটেম বন্দনা, সাবা-র আদিবাসীদের সূর্য উপাসনা, নবী ইব্রাহিমের গোত্রভুক্ত লোকদের নিজের হাতে তৈরি পুত্তলিকার আরাধনা কিংবা নবী মূসার লোকদের সোনালী বাছুর (গোল্ডেন কা'ফ) পূজার চাইতেও নিকৃষ্টতর ও অবিশ্বাস্য এই অন্ধত্ব।

বস্তুতঃ এই পরিস্থিতি কুরআনে আল্লাহ বর্ণিত বুদ্ধিভ্রংশজনিত। বহু সংখ্যক আয়াতে তিনি বলেছেন কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর হবে রুদ্ধ, সত্য দর্শনের শক্তিই তাদের থাকবে না। এই আয়াতগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

> যারা অবিশ্বাসী তাদের আপনি সতর্কবানী শোনান আর না-ই শোনান তাতে তাদের কিছু যায় আসে না, তারা বিশ্বাসী হবে না। আল্লাহ তাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তি রুদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখ রয়েছে কালো পর্দায় আবৃত। ভয়ঙ্কর শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য।
>
> —সূরা আল বাকারা ঃ ৬ - ৭

> . . . . . তাদের অন্তর আছে অনুধাবন নেই, চোখ আছে দৃষ্টি নেই, কর্ণ আছে শ্রবণ নেই। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, না, তার চেয়েও অধম তারা। তারা হচ্ছে উদাসীন, চেতনাবিহীন।
>
> —সূরা আল-আরাফ ঃ ১৭৯

> আমি যদি তাদের সামনে আসমানের দুয়ার খুলে দিই তবুও তারা সেই অভিমুখে আরোহণের চেষ্টা করে দিন-মাস শেষে বলবে, "আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে। নাকি, আমাদের চোখের সামনে মায়াজাল বিস্তার করা হয়েছে"!
>
> —সূরা আল-হিজর ঃ ১৪-১৫

এই মায়াজাল কী করে এমন বিপুল সংখ্যক মানুষকে মোহাবিষ্ট করে রাখলো, তাদেরকে সত্য দর্শন থেকে বঞ্চিত করলো এবং কেন সুদীর্ঘ ১৫০ বছরেও এই মায়াজাল ছিন্ন হল না — এটা এমন এক অপার বিস্ময় যা' ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যদিচ এটা স্বীকার্য যে দু'একজন বা গুটিকয় মানুষ অসম্ভব দৃশ্যপট তথা নির্বুদ্ধিতা ও অযৌক্তিকতাপূর্ণ দাবি বা মতবাদে বিশ্বাস করতেও পারে। অচেতন, নিষ্প্রাণ পরমাণুরা হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত করলো যে তারা সম্মিলিত হয়ে এমন একটি বিশ্ব সৃষ্টি করবে যা সংগঠন, শৃঙ্খলা, যুক্তি ও সচেতনতাঋদ্ধ একটি নিখুঁত পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং তার মধ্যে একটি গ্রহ যা প্রাণের অস্তিত্বের জন্য উপযোগী, সেখানে অসংখ্য জটিল জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতিসম্পন্ন জীবন্ত প্রজাতিসমূহ বিচরণ করছে—এই রকম উদ্ভট সব ধারণায় বিশ্বাসের ব্যাখ্যা "যাদু" ছাড়া আর কি হতে পারে ?

বস্তুতঃ আল্লাহ কোরআনে নবী মূসা (আঃ) বনাম ফেরাউন দ্বন্দ্ব বর্ণনায় ব্যক্ত করেছেন যে, নাস্তিক্যবাদী দর্শনের প্রবক্তা কিছু লোক যাদুবলে অন্যদের প্রভাবিত করে। ফেরাউনের কাছে সত্য ধর্মের বাণী তুলে ধরা হলে সে নবী মূসাকে বলে তার যাদুকরদের মোকাবেলা করতে। মূসা (আঃ) যাদুকরদের বলেন, তোমরা আগে তোমাদের তেলেসমাতি দেখাও।" তারপর কুরআন বলছেন ঃ

> তিনি (নবী মূসা) বললেন, "তোমরাই নিক্ষেপ কর।" যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তারা লোকজনের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দিল এবং লোকজন ভয়ানকভাবে তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হল। মস্ত বড় একটা যাদুর খেলা খেলে দেখাল তারা।
>
> — সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১১৬

ফেরাউনের যাদুকরেরা নবী মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ছাড়া আর সবাইকে প্রতারিত করতে পেরেছিল। নবী মূসা (আঃ) তাঁর বাহিত নিদর্শন উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরদের মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়, অথবা আয়াতের ভাষায় "যাদুকরদের জালিয়াতি গ্রাস করে ফেলে"।

> আমরা মুসার কাছে ওহী নাযিল করলাম, "তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।" নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তা যাদুকরদের জালিয়াতি গ্রাস করে ফেলল। এভাবেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তাদের প্রদর্শন মিথ্যা প্রমাণিত হল।
>
> — সূরা আল-আ'রাফ ১১৭ ঃ ১১৯

ওই আয়াত থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাদুকরেরা প্রথম যে ভেল্কি দেখায় তা যখন মিথ্যা প্রমাণিত হয় তখন তারা তাদের সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আজকের দিনেও যারা একই ধরনের যাদুর ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশধারী ওইসব হাস্যকর মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সারাজীবন তাদের সাফাই গেয়ে আসছে তারা যদি তাদের এই ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ না করে তাহলে সত্য যখন স্বপ্রকাশ হবে ও মিথ্যার মোহময় মায়াজাল ছিন্ন হবে তখন তারাও এমনি করেই অপদস্থ হবে। প্রণিধানযোগ্য, বিশিষ্ট নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক ও বিবর্তনতত্ত্বের সমর্থক ম্যালকম মাগারিজ স্বীকার করেছেন যে তিনি ঠিক ওই রকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেই উদ্বিগ্ন ঃ

আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, বিবর্তনতত্ত্ব, বিশেষতঃ তত্ত্বটির যতখানি প্রয়োগ করা হয়েছে, ভবিষ্যতের ইতিহাস বইগুলোতে এক বিরাট পরিহাসরূপেই পরিগণিত হবে। এ- রকম একটা তুচ্ছ, যুক্তিহীন ও সন্দেহজনক তত্ত্ব এমন অবিশ্বাস্য রকমের বিশ্বাসযোগ্যতা কিভাবে পেয়েছিল এ-কথা ভেবে হতবাক হয়ে যাবে ভবিষ্যতের মানুষ। ২৯

সেই ভবিষ্যৎ অতি দূর নয় যখন মানুষ বুঝতে পারবে "বিবর্তনতত্ত্ব" কতটা বিভ্রান্তিপূর্ণ এবং পেছন ফিরে তাকিয়ে বিবর্তনতত্ত্বকে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম প্রতারণা ও জঘন্যতম কুহকরূপে দেখবে। বিশ্বের সর্বত্র মানুষের কাঁধ থেকে এই কুহকের বোঝা ইতিমধ্যেই দ্রুত ঝেড়ে ফেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। বহু মানুষ বিবর্তনতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করে অবাকবিস্ময়ে ভাবছেন কিভাবে একদা এই তত্ত্বের মোহে তাঁরা আবিষ্ট হয়েছিলেন।

তারা বলল, "আপনি মহিমান্বিত! "আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। আপনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।"

—সূরা আল-বাকারা ঃ ৩২

লেখকের পরিচয়

লেখকের জন্ম ১৯৫৬ সালে আঙ্কারায়। হারুণ য়াহ্‌য়া তাঁর ছদ্মনাম। আঙ্কারায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যয়ন করেন।

১৯৮০'র দশক থেকে লেখক রাজনীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। বিবর্তনবাদীদের প্রতারণা, তাদের তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ফাসিজম ও কমিউনিজমের মত হিংস্র ভাবধারাসম্পন্ন আদর্শগুলোর সঙ্গে ডারউইনিজমের কলঙ্কিত আশ্লেষ উদঘাটন করে বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখে ব্যাপক খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেছেন লেখক।

ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সুবিদিত উচ্চ-সম্মানিত দুইজন নবীর নাম [হারুন (এ্যারন) ও য়াহ্‌য়া (জন)]-এর পুণ্য স্মৃতিতে লেখকের ছদ্মনাম হারুন য়াহ্‌য়া। তাঁর লেখা বইগুলোর মলাটের ওপর মুদ্রিত রসুলুল্লাহ্‌র সীলমোহরটি অন্তর্নিহিত লিপিসমষ্টির ব্যঞ্জনাসম্পৃক্ত প্রতীকস্বরূপ। লিপিত্রয়ীর প্রতীকী তাৎপর্য হচ্ছে, শেষ কিতাব কুরআন ও শেষ নবী মুহাম্মদ (দঃ)। নিরীশ্বর মতাদর্শগুলোর প্রতিটি মৌলিক তত্ত্ব কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মিথ্যা প্রমাণিত করা ও ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কুযুক্তিগুলো চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে "শেষ কথাটি" বলা তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরম জ্ঞান ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (দঃ)। ওই "শেষ কথাটি" বলার প্রতীক স্বরূপ শেষ নবীর সীলমোহরটি গ্রহণ করেছেন তিনি।

তার সকল রচনা একটি কেন্দ্রীয় আদর্শ ঘিরে ; কুরআনের বাণী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া ; আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, পরকাল, প্রভৃতি ধর্মসংক্রান্ত মৌলিক বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে মানুষকে উৎসাহদান এবং নিরীশ্বর মতবাদগুলোর দুর্বল ভিত্তি ও বিকৃত তত্ত্ব উদঘাটন করা।

হারুণ য়াহ্‌য়া পৃথিবীর বহু দেশ জুড়ে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর পাঠকেরা ছড়িয়ে আছেন ভারত থেকে আমেরিকা পর্যন্ত, ইংল্যাণ্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, পোল্যাণ্ড থেকে বসনিয়া এবং স্পেইন থেকে ব্রাজিল পর্যন্ত। তাঁর কয়েকটি বই অনূদিত হয়েছে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবী, আলবানীয়, রুশ, সার্বো-ক্রৌট (বসনীয়), পোলিশ, মালয়, উইগুর তুর্কী ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় এবং এগুলো পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র।

তাঁর বইগুলো পৃথিবীর সর্বত্র বহু মানুষকে ধর্মে বিশ্বাস ফিরে পেতে এবং ধর্মবিশ্বাসে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করেছে। গভীর প্রজ্ঞা, আন্তরিকতা ও প্রাঞ্জলতা বইগুলোর অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফলে যে কোন পাঠক বইগুলো পড়ে শক্তিশালী প্রভাব অনুভব করেন। বইগুলো ত্বরিৎ কার্যকর, নিশ্চিত ফলপ্রসূ ও অখণ্ডনীয়। এ বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে ও তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গভীরভাবে বিবেচনা করে কারও পক্ষে জড়বাদী দর্শন, নাস্তিক্য, কিংবা অন্য কোন বিকৃত মতবাদ বা দর্শন প্রচার করা প্রায় অসম্ভব।

যদি কেউ করে তবে সে কোন যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে নয় বরং নেহাতই ভাবলুতার কারণেই তা করবে, কারণ এ বইগুলো তার ভ্রান্ত মতবাদকে ইতোমধ্যেই ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করেছে। হারুন য়াহ্‌য়ার পুস্তকমালার সুবাদে আজ নাস্তিক্য-দুষ্ট সকল মতবাদের চলতি আন্দোলন সমূলে উৎখাত হয়েছে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বইগুলোর এসব বৈশিষ্ট্য কুরআনের প্রজ্ঞা ও প্রাঞ্জলতার প্রতিফলন বই কিছু নয়। লেখক মানবজাতির আল্লাহর সঠিক পথ

সন্ধানে মাধ্যম হতে চান শুধু। বইগুলোর প্রকাশনা থেকে কোন বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই।

এসব বিষয়ের আলোকে যারা হৃদয়ের "চক্ষু" উন্মীলনকারী ও আল্লাহর পথে আমন্ত্রণকারী এ বইগুলো পাঠে মানুষকে উৎসাহ দান করবেন তাঁরা একটি মূল্যবান ও মহৎ সেবা কর্ম সম্পাদন করবেন।

আরেকটি কথা। যেসব বই মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, মানুষকে আদর্শিক বিশৃঙ্খলায় নিপতিত করে এবং মানুষের চিত্তভূমি থেকে সংশয়কন্টক নির্মূলকরণ যেসব বইয়ের উদ্দিষ্ট নয় সেসব প্রকাশ ও প্রচার করা সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, যেসব বই মানুষকে বিশ্বাস-চ্যুতি থেকে রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে নয় বরং লেখকের সাহিত্য রচনার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য রচিত হয় সেসব বই এত শক্তিশালীরূপে কার্যকর হতে পারে না। যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তারা স্বচ্ছন্দেই দেখতে পাবে যে হারুণ য়াহ্য়ার বইগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে অবিশ্বাসকে জয় করে কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রসারণ। পাঠকের বিশ্বাসদৃঢ়তায়ই এই সেবার প্রভাব ও সাফল্য সুপ্রকাশ।

একটি কথা মনে রাখতে হবে। অধিকাংশ মানুষই যে অব্যাহত নৃশংসতা, সংঘাত ও বিপর্যয়ের শিকার তার প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্মহীনতার আদর্শিক অস্তিত্ব। এই অবস্থার অবসান হতে পারে কেবল ধর্মহীনতার আদর্শিক পরাজয়ে এবং সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্ময় ও কুরআনের নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে তন্নিষ্ঠ জীবনাচরণে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে। আজকের বিশ্বপরিস্থিতিতে, যখন মানুষ ক্রমাগত হিংসা, দুর্নীতি ও সংঘাতের অধোমুখী চক্রে চালিত হচ্ছে, এ কাজটি আরো দ্রুততা ও কার্যকরিতার সঙ্গে করতে হবে। নইলে বড্ড দেরি হয়ে যেতে পারে।

টীকা

1. Buyuk Hadis Kulliyati (Great Ahadith Collection), Cem-ul-fevaid min Cami'il-usul and Mecma'iz-zevaid, Imam Muhammad Bin Muhammad Bin Sulayman er-Rudani 5
2. Sahih Bukhari, Volume 8, Book 75, Number 351.
3. Ramuz El-Hadis, Vol 1, p. 22.
4. Al-Tirmidhi, Destiny 10, 2145.
5. Al-Tirmidhi, Birr 55, 1988.
6. Ramuz El-Hadis, Vol 1, P. 137
7. Ramuz El-Hadis. Vol. 1, p. 13
8. Ramuz El-Hadis, Vol. 1, p. 7.
9. Hugh Ross, The Fingerprint of God, p. 50.
10. Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York ; Marcel Dekker, 1977, P-2.
11. Alexander I. Oparin, Origin of Life, 1936) New York, Dover Publications, 1953 (reprint), p. 196.
12. "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and life", Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 63, November 1982, p. 1328-1330.
13. Stanley Miller, Molecular Evolution of Life : Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, p. 7.
14. Jeffrey Bada, Earth, February 1998, p. 40.
15. Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American, Vol. 271, October 1994, p. 78.
16. Charles Darwin, The Origin of Species A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press. 1964, P, 189.
17. Charles Darwin, The Origin of Species : A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 184.

18. B.G. Ranganathan, Origins ? Pennsylvania : The Banner of Truth Trust, 1988.

19. Charles Darwin, The Origin of Species : A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 179.

20. Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, vol. 87, 1976, p. 133.

21. Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York, Pantheon Books, 1983. P. 197.

22. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York, Toplinger Publications, 1970, SS. 75-94 ; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution : Grounds for Doubt", Nature, Vol 258, p. 389.

23. J. Rennie, "Darwin's Current Bull dog : Ernst Mayr", Scientific American, December 1992.

24. Alan Walker, Science, Vol. 207, 1980, p. 1103 ; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York, J. B. Lipincott Co., 1970, p. 221 ; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol, 3, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 272.

25. Time, November, 1996.

26. S. J. Gould, Natural History, vol. 85, 1976, p. 30.

27. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York, Toplinger Publications, 1970. P. 19.

28. Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World," The New York Review of Books, 9 January, 1997 P-28.

29. Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids : Eerdmans, 1980. P. 43.